বেগম

রোকেয়া

জীবন সংগ্রাম ও শিক্ষা

খালেকুজ্জামান



সমাজতান্ত্রিক
মহিলা ফোরাম

বেগম রোকেয়া

জীবন সংগ্রাম ও শিক্ষা

খালেকুজ্জামান

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম

বেগম রোকেয়া
জীবন সংগ্রাম ও শিক্ষা

খালেকুজ্জামান

প্রকাশক : সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম
কেন্দ্রীয় কমিটি
২৩/২ তোপখানা রোড (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৮২২০৬, ০১৭১৬ ৫৭৫ ২৭৭
ফ্যাক্স : ৯৫৫৪৭৭২
ই-মেইল : swfcc.bd@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১, ঢাকা, বাংলাদেশ

দ্বিতীয় প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৯, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ : আব্দুর রাজ্জাক রুবেল

মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া
১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২৭১৯১৭৪৭ ই-মেইল : p.gronthik@gmail.com

মূল্য : ৮০ টাকা

প্রথম মুদ্রণের ভূমিকা

বেগম রোকেয়া এদেশের নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ। নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকার তুলনা হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু মানুষের দুঃখ, বিশেষ করে অবহেলিত নারীসমাজের অবর্ণনীয় দুর্গতির বাস্তব চিত্র উপস্থিত করে শ্লেষ ও বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে, কৌতুকরস সৃষ্টি করে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ হাজির করে, ঐতিহাসিক নজির তুলে ধরে, উন্নত জীবনের স্বপ্ন সামনে এনে, উঁচু স্তরের রুচি ও মূল্যবোধের আবেদন দিয়ে, বিবেকের কষাঘাতে নারীমুক্তির যে আকুতি রেকেয়া তাঁর সাহিত্যকর্ম ও জীবনসংগ্রামের মধ্যে রেখে গেছেন, সেখানে তিনি অনন্য ও বিশিষ্ট। কিন্তু সাম্প্রতিক নারী নির্যাতন ও বৈষম্যের ক্রমবর্ধমান চিত্র পরিষ্কারভাবে আমাদের দেখিয়ে দেয় রোকেয়ার জীবন সংগ্রাম এবং চিন্তা, শিক্ষা ও সাহিত্যকর্ম থেকে আমরা কত দূরত্বে অবস্থান করছি। পথে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে নারীর উপর সহিংসতা, লাঞ্ছনা, অপমানের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। ভোগসর্বস্ব জীবনবোধ, অবক্ষয়ী সংস্কৃতি আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে সভ্যতা, নারীত্বের সম্মান। আবার আমাদের দেশের নারীসমাজও রোকেয়ার জীবন ও চিন্তা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর পুঁজিবাদসৃষ্ট সার্বিক সামাজিক অবক্ষয়ের এই সময়ে মানুষের মতো বাঁচতে হলে, মনুষ্যত্বকে রক্ষা করতে হলে, পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের উচ্ছেদের সংগ্রাম জোরদার করতে হলে এবং অর্ধেক জনশক্তি নারীসমাজকে জাগিয়ে এ আন্দোলনে শামিল করতে হলে রোকেয়ার জীবন ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষাগ্রহণ খুব জরুরি বলে আমরা মনে করি। সে লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের ১২ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম আয়োজিত রোকেয়া দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান। তাঁর ওই বক্তব্য এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সভায় উপস্থাপিত বক্তব্য সংকলন ও সম্পাদনা করে বর্তমান পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে।

আমরা আশা করি, বেগম রোকেয়ার সমাজচিন্তা, জীবন সংগ্রাম ও সাহিত্যকর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে নারীমুক্তি সংগ্রাম গড়ে তোলার সেই উদ্দেশ্য পূরণে এ পুস্তিকা সহায়ক হবে।

রওশান আরা রুশো
সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, কেন্দ্রীয় কমিটি
জানুয়ারি ২০১১

দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

বেগম রোকেয়া বাংলাদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ। সমাজে নারীকে মানুষ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, নারীর সামনে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার সাহস, যুক্তি ও আপন প্রত্যয় নির্মাণের লক্ষ্যে আজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন—লেখনী ধরেছেন, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, সংগঠন গড়ে তুলেছেন। বেগম রোকেয়া সমাজে নারীর যে অবস্থান দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর ৮৬ বছর পরও আমরা তার কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারিনি। বাহ্যিকভাবে হয়তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে বলে বোধ হবে; নারী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও হচ্ছেন। কিন্তু সমাজ মননে আরও বিরাট অবক্ষয় ঘটে গেছে।

সারাদেশে নারী-শিশু ধর্ষণ-নির্যাতন-হত্যা এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। দুই বছরের শিশুকন্যা বা ৬০ বছরের বৃদ্ধা যেকোন বয়সের নারী; হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান বা মুসলিম যেকোন ধর্মের নারী; পাহাড়ে বা সমতলে, ঘরে-পথে-স্কুলে-কারখানায় যেকোন স্থানে; দিনে বা রাতে যেকোন সময়ে বাংলাদেশে একজন নারী নির্যাতনের শিকার হতে পারেন। ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অপহরণ, বন্দি করে রেখে গণধর্ষণ, যৌতুকের জন্য নির্যাতন-হত্যা, বখাটেদের উৎপীড়ন, গণপরিবহনে যৌন হয়রানি, ইন্টারনেটে ব্লাকমেইলসহ ঘরে বাইরে নানা উৎপীড়ন, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন এমন মাত্রায় পৌঁছেছে যে উৎকণ্ঠার বাইরে কোনো নারীর পক্ষে স্বাভাবিক জীবনযাপন কল্পনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরও বাংলাদেশের আইনে নারী সমানাধিকার পান না। সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব অর্থাৎ পারিবারিক জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইনে নারী বৈষম্যের শিকার হন। সমকাজে সমমজুরি আইনে থাকলেও; বাস্তবে প্রায় সমস্ত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী, পুরুষের তুলনায় কম মজুরি পেয়ে থাকেন। এখনও সরকারি হিসাব মতেই ১০০ জনে ৫২ জন নারীর বাল্য বিবাহ হয়। নারীরা দিনে প্রায় ১৬ ঘণ্টায় গড়ে ৪৫ ধরনের কাজ করেন। পুরুষের তুলনায় নারীরা প্রায় সাড়ে ৩ গুণ কাজ বেশি করেন। কিন্তু নারীর গৃহস্থালি কাজের আর্থিক মূল্য এখনও জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এখনও এমন যে সন্তান লালন-পালনসহ পরিবার ও ঘর-গৃহস্থালি কাজের দায়িত্ব যেন কেবল নারীর। এলাকা ও কর্মক্ষেত্রে ডে-কেয়ার সেন্টার, গণপরিবহনে নারীর নিরাপত্তা, নারীদের জন্য

জেলা-উপজেলায় হোস্টেলসহ রাষ্ট্রীয় প্রায় কোন আয়োজন না থাকায় কর্মক্ষম, শিক্ষিত অনেক নারীই কর্মক্ষেত্রে আসতে পারছেন না বা কর্মক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়ছেন। একই দেশে এখানে দুই আইন বলবৎ; সরকারি চাকরিতে ৬ মাস সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি আর বেসরকারি চাকরিতে ৪ মাস সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটির নিয়ম বিদ্যমান রয়েছে। সেটাও অধিকাংশক্ষেত্রেই কেবল খাতা-কলমে; বাস্তবে শ্রমিক নারীরা গর্ভবতী হলে তার কপালে জোটে ছাঁটাই। এছাড়াও নারীকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের তেমন কোন উদ্যোগ নেই। বিজ্ঞাপন, নাটক, সিনেমায় নারীকে পণ্যরূপে উপস্থাপন করা হয়। পর্নোগ্রাফি ও মাদক বন্ধে সরকারের কোন কার্যকর উদ্যোগ নেই। মহীয়সী নারীদের জীবন ও কর্ম, বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভূক্তকরণ বা রাষ্ট্র ও সমাজে তেমন মূল্যায়িত হয় না। অন্যদিকে ওয়াজ-মহফিলে নারীকে নিয়ে অশ্লীল-কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেওয়া হয়। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও ফতোয়া দিয়ে নারীর উপর অত্যাচার করা হয়।

এই নির্মম বাস্তবতা ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তনে, সমাজের সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, নারীমুক্তির আন্দোলনে বেগম রোকেয়া আজও প্রেরণার উৎস। প্রথম মুদ্রণের সকল কপি বহু পূর্বেই নিঃশেষ হয়েছে। বেগম রোকেয়ার বক্তব্য ও সংগ্রামকে মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পুস্তিকাটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হলো। **বেগম রোকেয়ার বিভিন্ন লেখনীতে তৎকালীন ব্যবহৃত বানানরীতিকে এখানে অক্ষত রাখা হয়েছে।**

রওশন আরা রুশো
সভাপতি

শম্পা বসু
সাধারণ সম্পাদক

নভেম্বর ২০১৯

বেগম রোকেয়া

জীবন সংগ্রাম ও শিক্ষা

জীবনসংগ্রামের সুদীর্ঘ পথে এককালের মানুষ যে মানবিক গুণ অর্জন করে তা পরবর্তী মানুষের চরিত্র ও কর্মের মধ্যে, তার সৃষ্টির মধ্যে সমষ্টিগত বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হয়ে বিরাজ করে। এ সমস্ত গুণাবলি ব্যক্তিকৃত হয়ে একেকজন মানুষের মধ্যে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে যা দেখে মানুষ বিমোহিত হয়, আত্মোৎসর্গের মনোভাবে উদ্দীপ্ত হয়, জীবনকে পূর্ণতা দেয়ার রাস্তা খুঁজে পায়। তেমনি ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন রোকেয়া। আপসহীন স্বাধীনতাকামী সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্রতী বহুব্যাপৃত চিন্তাবিদ রামমোহন-বিদ্যাসাগর উত্তর ভারতীয় রেনেসাঁর পতাকাবাহী নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া আজ থেকে ১৩০[১] বছর আগে জন্মেছিলেন। শিক্ষার আলো, বিদ্যুতের আলো আর আধুনিক জীবনের ছোঁয়াবঞ্চিত এক অজপাড়াগাঁ রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রাম ছিল এই অসাধারণ তেজোদ্দীপ্ত সংগ্রামী নারীর জন্মস্থান। প্রখর যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক এই মহীয়সী নারী হৃদয়বৃত্তিতেও ছিলেন অনেক বড়। যে কারণে বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন দরদ ও গভীর ভালোবাসা। তাঁর সময়ে ভারতীয় সমাজের কোনো নারী চিন্তাশক্তির ব্যাপ্তি, দীপ্তি বা গভীরতায় কিংবা সম্পূর্ণ বৈরি পরিবেশে কর্মোদ্যোগের সাহসী সংকল্প পদক্ষেপের দৃঢ়তায় তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না—একথা সহজেই বলা যায়।

পরাধীন দেশের কুসংস্কার-কূপমণ্ডূকতা আর ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন মুসলমানসমাজে রোকেয়ার আবির্ভাব নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় রামমোহন-বিদ্যাসাগরের পথ ধরে রেনেসাঁর ঝরনাধারা ভারতের বুকে নবজাগরণের তরঙ্গ তুলে ছড়িয়ে পড়লেও মুসলমানসমাজকে তা তেমন আন্দোলিত করতে পারেনি। সেই পাষাণপুরীর ভেতর থেকেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন বেগম রোকেয়া। বাংলার অচল-অনড় মুসলমানসমাজের ভিত্তিমূলে

---

১. ২০১৯ সাল অনুসারে ১৩৮ বছর

একটা প্রবল নাড়া তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব একটি ক্ষীণ স্রোতধারা রূপে আমাদের সমাজমননে আজও বহমান। যে সমাজপরিবেশ থেকে বেগম রোকেয়ার অভ্যুদয় এবং যে প্রতিকূলতা সেদিন তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল, স্থান-কালের ওই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করলে শুধু বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের নারীজাগৃতির ইতিহাসে তাঁকে অনন্য মনীষার স্বীকৃতি দিতে হয়।

১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়ার কর্মময় জীবনের অবসানের পর কলকাতার এলবার্ট হলের স্মরণসভায় সৈয়দ এমদাদ আলী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—

> 'তাঁহার স্মৃতির উপরে আজ বাঙলার মুসলমানসমাজ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছেন, বাঙলার কোন মুসলিম পুরুষের মৃত্যুতে সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া জানিনা। ইহা শুধু যুগলক্ষণ নয়, ইহা আমাদের জাগরণের লক্ষণ।'[২]

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—

> 'রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন বাস্তবিক যে কত বড় ছিলেন, তাহা বাহিরের লোকদের কাছে অজানা রহিয়া গেল। যাঁহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা নিজেদের জীবনে রোকেয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে কী ছিলেন, তাহা বাহিরের জগৎকে জানানো সকলের শক্তি বা সাধ্যের আয়ত্ত নহে। হিমালয় দেখিয়া আমরা সবাই অভিভূত হইতে পারি, কিন্তু কয়জনে হিমালয় দর্শনে যে আনন্দের অধিকারী আমরা হই তাহা ভাষায় বর্ণনা করিয়া অপরকেও শরিক করিয়া লইতে পারি।'[৩]

১৯৩৭ সালে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক কবি মোহিত লাল মজুমদার বলেছিলেন—

> 'নারীকে হিন্দু যে শক্তির আধার বলিয়া পূজা করে, নারীচরিত্রে যে একটি সহজ মহিমা ও শুচিতা আছে যাহা প্রাকৃতিক শক্তির মতো স্বতঃস্ফূর্ত এবং পুরুষের পক্ষে অনেক স্থানেই যাহা সাধনসাপেক্ষ, তাহার পরিচয় পাই এই মহীয়সী নারীর চরিত্রচিত্রে। লতা যেমন আপনিই আলোকের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে, যতই বাধা পাক তবুও সেই দিকেই তাহার গতি—এই নারীর জীবনে সত্য ও সুন্দরের প্রতি একটি অনিবার্য প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ...একালে হিন্দু সমাজেও এমন নারী চরিত্র বিরল। কিন্তু তজ্জন্য হিন্দু আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না; কারণ বেগম রোকেয়া শুধুই মুসলিম মহিলা নহেন, তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস

২. বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য-মোতাহার হোসেন সূফী, সুর্বণ, ঢাকা (এপ্রিল ২০০১) পৃ. ৩০
৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা

জন্মিয়াছে যে তিনি খাঁটি বাঙ্গালির মেয়ে।'[৪]

সাহিত্যিক আবুল ফজল রোকেয়ার জীবদ্দশায়ই লিখেছিলেন—

> 'যে সমাজে পুরুষদের মধ্যে একটা বিশেষ সাধনা নেই, কোনো একটা বিশেষ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলবার জন্য মরিয়া হয়ে লেগে থাকা, বাধা বিপত্তি উন্নতি অবনতিকে তুচ্ছ করে নিজের অন্তর্নিহিত সাধনালব্ধ সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকা অভ্যাস নেই—সে সমাজে কেমন করে এমন ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রতিমূর্তি, একনিষ্ঠ সাধনার প্রতীক এই অসাধারণ মেয়েটির জন্ম সম্ভব হল।'

বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর এক রক্ষণশীল সামন্ত ভূস্বামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যনাম ছিল রোকেয়া খাতুন। সবাই ডাকত রুকু বলে। তাঁর পিতা জহির উদ্দিন আবু আলী সাবের চারটি বিবাহ করেন যার মধ্যে রোকেয়ার মা রাহাতুন্নেসা চৌধুরী ছিলেন প্রথম। রাহাতুন্নেসা চৌধুরীর দুই পুত্র আবুল আসাদ মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাবের ও খলিলুর রহমান আবু জায়গাম সাবের এবং তিন কন্যা করিমুন্নেসা, রোকেয়া ও হোমায়েরা। বিলাসী এবং অমিতব্যয়ী আবু আলী সাবের পরিবারের অর্থকৌলিণ্যের ভাঙনের সময় রোকেয়ার জন্ম হয়। একদিকে নারীর ওপর পুরুষতন্ত্রের চাপানো অবরোধ প্রথা, অন্যদিকে অশিক্ষার অভিশাপ—এমনি এক পারিবারিক সামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন বেগম রোকেয়া। মেয়েদের লেখাপড়া সে যুগে ছিল পাপতুল্য এবং সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। তদানীন্তন হিন্দু সমাজেও মেয়েদের পড়ালেখার বিষয় স্বীকৃত ছিল না। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে যেকোনো মেয়ের জন্য আধুনিক চিন্তাভাবনা ছিল পরিত্যাজ্য। রোকেয়া তাঁর শৈশবের স্মৃতি তুলে ধরে বলেন—

> 'সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রী লোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই, অথচ পর্দা করিতে হইত। ...দৈবাৎ ...যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম তবে হিতৈষিণী মুরুব্বীগণ, কলিকালের মেয়েরা কি বেহায়া, কেমন বেগয়রৎ ইত্যাদি বলিয়া গঞ্জনা দিতে কম করিতেন না।'[৫]

রোকেয়া নানিমার মুখে একথাও শুনেছেন যে, নারী অধঃস্তন এবং পুরুষের সেবা করার জন্যই তার সৃষ্টি। এ নিয়ে বাল্যকালেই রোকেয়ার মনে সংশয় জেগেছিল। ক্রমে তিনি বুঝেছিলেন, নানিমার এ জ্ঞান বহুদিনের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকেই পাওয়া।

---

৪. বেগম রোকেয়া-আব্দুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ১৯৮৩) পৃ. ৯

৫. রোকেয়া রচনাবলী, অবরোধবাসিনী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৩৯৬

রোকেয়া তাঁর ভাই ইব্রাহিম সাবের ও বোন করিমুন্নেসার কাছ থেকে কিছু ইংরেজি ও বাংলা শিখেছিলেন। করিমুন্নেসা নিজের একান্ত চেষ্টায় ইব্রাহিম সাবেরের উৎসাহে বাংলা শিখেছিলেন। আরবি, ফারসির পাশাপাশি ইংরেজিও কিছুটা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। ধর্মাচরণের জন্য যতটা আরবি জানা দরকার তার বাইরে শিক্ষাকে ভাল চোখে দেখা হতো না বিধায় করিমুন্নেসাকে এই উৎসাহ ও আগ্রহের কারণে বাল্যবিবাহের বলি হতে হয়েছিল। করিমুন্নেছা পারিবারিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। তার বিকশিত জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে যেভাবে সামাজিক-ধর্মীয় অনুশাসন চাপানো হয়েছিল তা ছোট বোন রোকেয়ার মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। বড়বোন সম্পর্কে রোকেয়া বলেছিলেন—

> 'সমাজ তাঁহাকে গলা-টেপা করিয়া না রাখিলে করিমুন্নেসা সাহেবা দেশের একটি উজ্জ্বল রত্ন হইতে পারিতেন।'[৬]

সবাই ঘুমিয়ে গেলে রোকেয়া গোপনে মোমের আলো জ্বেলে একাগ্রচিত্তে স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠার সাধনায় মগ্ন হতেন। ওই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে পরবর্তী জীবনে তিনি লিখেছেন—

> 'বালিকা বিদ্যালয় বা স্কুল-কলেজ-গৃহের অভ্যন্তরে আমি কখনও প্রবেশ করি নাই। কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয়-স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান করবেন দূরে থাকুক, বরং নানা প্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করতেন—কিন্তু তথাপি আমি পশ্চাৎপদ হই নাই।'[৭]

১৮৯৬ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয় বিহারের ভাগলপুর নিবাসী বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে। উর্দুভাষী সাখাওয়াত হোসেন ইংল্যান্ডে কৃষি বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি এবং রয়েল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি ওড়িষ্যার কনিকা গেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডসে ম্যানেজার নিযুক্ত ছিলেন। তার প্রথম স্ত্রীর একটি কন্যা সন্তান ছিল। রোকেয়ার গর্ভে দুটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু জন্মের ৪ মাস পর একজন এবং ৫ মাস পর অন্যজন মারা যায়। সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের উদারচেতা শিক্ষিত মন রোকেয়ার জ্ঞানসাধনার সহায়ক হয়েছিল। সাখাওয়াত হোসেন ডায়াবেটিসসহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৯০৯ সালের ৩ মে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের ১৩ বছরের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে, ২৯ বছর বয়সে রোকেয়া বিধবা হন।

৬. রোকেয়া রচনাবলী, লুকানো রতন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২৩৩
৭. রোকেয়া জীবনী-শামসুন নাহার মাহমুদ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা (মার্চ ১৯৯৬) পৃ. ২১

স্বামীর মৃত্যুর পর শুরু হয় তাঁর জীবনসংগ্রামের নতুন অধ্যায়। ১ অক্টোবর ১৯০৯-এ ৫ জন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে থাকার ঘরে তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সপত্নী কন্যা ও জামাতা সম্পত্তির লোভে রোকেয়ার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। আদর্শবাদী রোকেয়া কখনও ব্যক্তিগত বিষয়সম্পত্তিগত স্বার্থভাবনার ওপর নিজেকে দাঁড় করাননি। ফলে ঘর, সম্পত্তি আর নিরাপত্তার মোহ ত্যাগ করে অজানা উদ্দেশ্যে তাঁকে পাড়ি দিতে হল। ১৯১০ সালের ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় সৈয়দ আব্দুস সালেকের বাড়িতে তিনি অস্থায়ী আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ ১০নং অলিউল্লাহ লেনের ছোট ভাড়া বাড়িতে ৮ জন ছাত্রী নিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। ওই বছর পর্যন্ত কলকাতায় মেয়েদের জন্যে বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল এবং ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলসহ ৭টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৬টি মিডল ইংলিশ স্কুল, ৫টি ভার্নাকুলার স্কুল, ৪১টি উচ্চ প্রাথমিক এবং ৪১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। মুসলমান মেয়েদের জন্য নিম্ন প্রাথমিক উর্দু স্কুল ছিল ১৪টি, ২৫টি কোরআন স্কুল অর্থাৎ মক্তব। কিন্তু বাংলাভাষী মুসলমান বালিকাদের জন্য একটিও নিম্ন প্রাথমিক কিংবা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে রোকেয়া তৎকালীন বহুল প্রচারিত পত্রিকা *The Musalman*-এর সম্পাদক মুজিবর রহমানকে ১৯১১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি চিঠি লিখে স্কুল খোলার ইচ্ছা এবং সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। ইংরেজিতে লেখা ওই চিঠিতে তিনি বলেছিলেন—

> 'আপনার পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানসমাজকে একথা জানাতে চাই যে, আমি পর্দার কঠোর শর্ত মেনে যত দ্রুত সম্ভব কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, এটা শুধু সময়ের আকুতি মাত্র নয়, সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নর-নারী এর গভীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। আমার প্রিয় স্বামী, প্রয়াত মৌলবি সাখাওয়াত হোসেন বি.এ. যিনি প্রাদেশিক প্রশাসনিক বিভাগে কার্যরত ছিলেন, নারী শিক্ষার জন্য ১০,০০০ রুপি দান করে গিয়েছেন। এই অর্থের আয় (বাৎসরিক ৬,০০০ রুপি) আমার কাছে গচ্ছিত রয়েছে। এ অর্থ শুধু দান করেই আমি দায়িত্ব শেষ করতে চাই না, সাথে সাথে এ বিদ্যালয় পরিচালনা করতে এবং এর উন্নয়নের স্বার্থে আমার সময়, শক্তি, অর্জিত জ্ঞান পূর্ণ নিয়োজিত করতেও আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু সমস্ত প্রয়োজন মিটানোর স্বার্থে এ তহবিল খুবই অপ্রতুল। অতএব আমি সদয় মুসলিমসমাজের কাছে তাদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবার আবেদন করছি।'[৮]

৮. রোকেয়া রচনাসংগ্রহ-ড. মীরাতুন নাহার, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা (৯ ডিসেম্বর ২০০১) পৃ. ৫২৫

যে বাড়িটি স্কুলের জন্য নির্ধারিত হলো, সেটিই ছিল তাঁর বাসস্থান। একজন যুবতী মেয়ে সামাজিক দায়িত্বের কঠিন কঠোর সংকল্পের আগুনে ব্যক্তিগত সকল চাওয়াকে পুড়িয়ে ব্রত পালনের দুঃসাহসে ভর করে একাকী কর্মক্ষেত্রে নেমে চতুর্মুখী বৈরি পরিবেশ ও পরিস্থিতি মোকাবিলা করে এগোতে থাকেন। বাবা, স্বামী এবং পুত্রের আশ্রয় ছাড়া যে নারীর কোনো নিরাপদ আশ্রয় ভূ-ভারতে নেই, রোকেয়া তা বাস্তবে নতুনভাবে অনুভব করেন। একপর্যায়ে ভেবেছিলেন মা সঙ্গে না থাকলে হয়তো কলকাতায় থাকা হবে না। কিন্তু এক বছরের ব্যবধানে ১৯১২ সালে মা এবং ১৯১৩ সালে বাবাকে হারান। রোকেয়া দমে না গিয়ে হিমালয়ের মতো উঁচু-অটল-সংকল্প-দৃঢ়তায় বাধার পর বাধা অতিক্রম করে সাফল্যের সোপানে একটি একটি করে ইট গাঁথতে থাকলেন। তাকে সমাজচ্যুত করে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করে অপমান-অবমাননার শেল হেনে বাইরের জগৎ-জয়ের সংকল্প থেকে সরিয়ে এনে নারীর জন্য চলে আসা বিধান 'ঘরে ফেরানো'র জন্যও একদল সুহৃদের(!) আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর সম্বন্ধে এমনও অপপ্রচার ছিল যে—

> 'যুবতী বিধবা স্কুল স্থাপন করিয়া নিজের রূপ যৌবনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন।'[৯]

একটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই সময়ের বিখ্যাত *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের লেখা থেকে জানা যায়, ওই পত্রিকায় প্রকাশিত নারীলেখকদের ছবি দেখে সিলেটের এক জমিদার চা-বাগান মালিক রোকেয়াকে চিঠি লিখে দুজন নারীলেখকের নাম উল্লেখ করে তাদের সাথে বিয়ের ঘটকালি করার জন্য অনুরোধ জানান। দুই লেখকের একজন আবার নাসিরউদ্দীনের স্ত্রী। মর্মাহত রোকেয়া বলেছিলেন—

> 'যে দেশের একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এরূপ ধরনের চিঠি প্রকাশ্যে লিখতে পারে, সে দেশের পুরুষসমাজ কত নিম্নস্তরের এবং মেয়েদের প্রতি তাহাদের ব্যবহার কত অশিষ্ট তা সহজেই ধারণা করা যায়।'[১০]

এমনও শোনা যায় যে রোকেয়াকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে বহু গণ্যমান্য প্রভাবশালী ব্যক্তি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। রোকেয়া ওইসব প্রস্তাব অত্যন্ত পীড়িত মনে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এতে তিনি অনেকেরই বিরাগভাজনও হয়েছিলেন।

যে দশ হাজার টাকা সাখাওয়াত হোসেন রেখে গিয়েছিলেন তাও নিঃশেষ হতে থাকল। স্কুল খুলবার ৮ মাস পর চারিদিক অন্ধকার করে অর্থসংকট আরও

৯. বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য-মোতাহের হোসেন সুফী; সুর্বণ, ঢাকা (এপ্রিল ২০০১) পৃ. ৪৮
১০. রোকেয়া রচনাসংগ্রহ-ড. মীরাতুন নাহার, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা (৯ ডিসেম্বর ২০০১) পৃ. ৬২২

তীব্র হল। প্রথমে যে সমস্ত গণ্যমান্য লোকেদের সহায়তা পাবেন ভেবেছিলেন তারাও তাঁকে নিরাশ করল। তৎকালীন বিশিষ্ট মুসলিম সমাজপতি এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অসহযোগিতামূলক মনোভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া কলকাতার বাইরেও বিভিন্ন স্থানে দেখা গিয়েছিল। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত *পল্লীবান্ধব* নামের একটি পত্রিকায় বলা হয়—

> 'স্কুল কমিটি বহুবার সমাজের খেদমতে আর্জি পেশ করিয়াছেন অথচ সমাজ নীরব। নেতাগণ চুপ। যাহারা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য শতকরা ৫৫ এর ধুয়া ধরিয়া দুনিয়াব্যাপী কসরত করিয়া বেড়ান তাহারা এমন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু করতে পারেন কিনা তাহার বিচারের সময় আসিয়াছে। মুসলমানেরা বেশির ভাগ গরীব এ কথা স্বীকার করি কিন্তু তিন কোটি মুসলমানই ভিক্ষুক ইহা অসত্য। সমাজ নেতাগণ একটু চোখ খুলুন।'[১১]

তারপরও তেমন সাড়া এসেছিল বলে কোনো প্রমাণ মেলেনি। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও সারা পৃথিবীতে যেন একটা শূন্য উদ্যানে দাঁড়িয়ে রোকেয়া একাকিনী হয়ে গেলেন। ওই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন—

> 'এই আঠার বৎসর ধরিয়া এই গরীব স্কুলকে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য কেবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। দেশের বড় বড় লোক—যাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতে রসনা গৌরব বোধ করে, তাঁহারাও প্রাণপণে শত্রুতা সাধন করিয়াছেন।...স্কুলের অনিষ্ট করিতে কতকগুলি লোক বদ্ধপরিকর আছেন। কোনো কারণে আমার প্রতি কেহ বিরক্ত হইলে তিনি আমার অনিষ্ট কামনায় এই স্কুলের অনিষ্ট করিয়া বসেন। আমি নিজে এমনই নির্বাণ (মুক্তি) লাভ করিয়াছি যে, আমার অনিষ্ট কেহ করিতে পারে না। কারণ, 'ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।' লোকে আমার কি করিবে? আমার মেয়ের বিবাহ পণ্ড করিবে? আমার ছেলের বিবাহ ভাংচি দিবে? আমার নিজের পার্থিব কি আছে যাহা কেহ নষ্ট করিবে?... এই স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে আমি নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য একটি মিথ্যা কথা বলি নাই এবং স্কুলের একটি পয়সা নিজে ভোগ করি নাই।'[১২]

এই অপার মানসিক বল ও চেতনার ইস্পাতদৃঢ় শক্তিতে পথ কেটে কেটে তিনি পথ চলতে থাকলেন। তিনি দুঃখ করে বলেন—

> 'এই স্কুলটা না থাকলে আমার তিলমাত্র ক্ষতি নাই। তবে এ স্কুলের উন্নতি

---

১১. বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য-মোতাহের হোসেন সুফী, সুর্বণ, ঢাকা (এপ্রিল ২০০১) পৃ. ৫১
১২. বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য-মোতাহের হোসেন সুফী, সুর্বণ, ঢাকা (এপ্রিল ২০০১) পৃ. ৪৮-৪৯

> কেন চাই?—চাই নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়; চাই স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্য নয়; চাই বঙ্গীয় মুসলিমসমাজের কল্যাণের জন্য। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' শব্দ দুটির জন্য যদি স্কুলের অকল্যাণ হয়, তবে সাইনবোর্ড থেকে ও শব্দ দুটি মুছে ফেলা যাক। অবশ্য মুসলিমসমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ, আমার কোন বংশধর নাই যে, তাদের ভাবী দুর্দ্দশার আশঙ্কায় আমি শঙ্কিত হব, কিম্বা তাদের দুষ্ক্রিয়া দেখে আমি লজ্জিত হব। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন, এই স্কুল সম্বন্ধে মাথা-ব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই। যাঁদের বংশধর আছে, যাঁদের ভবিষ্যৎ আছে, তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয়া এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গঠিত করুন।'[১৩]

লোভ, লালসা, মোহ, খ্যাতি ইত্যাদি সকল কিছু থেকে মুক্ত থেকে শুধুই চেতনা, দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করার যে সংস্কৃতি এবং ভাবমানস রোকেয়া নিজের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন তার সাক্ষাৎ আমরা পাই তাঁর একটি ঐতিহাসিক উপমার উল্লেখ থেকে। তিনি বলেছেন—

> 'হযরত রাবেয়া বসরী বলিয়াছেন, 'ইয়া আল্লাহ! যদি আমি দোযখের ভয়ে এবাদত করি, তবে আমাকে দোযখে নিক্ষেপ কর। আর যদি বেহেশতের আশায় এবাদত করি, তবে আমার জন্য বেহেশত হারাম হউক।' আল্লার ফজলে সমাজসেবা সম্বন্ধে আমিও ঐ রূপ বলতে সাহস করি।'[১৪]

এ ধরনের আত্মকেন্দ্রিক বস্তুগত ও ভাবগত স্বার্থমুক্ত এতটা উন্নত সংস্কৃতি মানের ব্যক্তিত্ব আজকের দিনেও বিরল।

স্বামীর স্মৃতিরক্ষার চেয়েও স্কুল রক্ষার বিষয়টিই যে রোকেয়ার কাছে বড় ছিল সেটা যে শুধু কথার কথা নয় তা বোঝা যাবে ১৯৩২ সালের ২৫ এপ্রিল খান বাহাদুর তোসাদ্দেক আহমেদকে লেখা চিঠি থেকে। তিনি লেখেন—

> 'ভাই সাহেব আপনি ঘুণাক্ষরেও ভাববেন না যে, আমার শ্রদ্ধেয় স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্যই আমি এ স্কুল আঁকড়ে পড়ে আছি। সরকারের সাথে স্কুল বিষয়ে লিখিত আমার চিঠিপত্রের কথা আপনি মনে করে দেখুন, গভর্নমেন্ট এই স্কুলের নতুন নামকরণ 'Government H. E. School for Muslim Girls' অর্থাৎ মুসলিম বালিকা উচ্চ ইংরাজী সরকারী বিদ্যালয় করতে চেয়েছেন, তাতে আমি সেই মুহূর্তেই রাজী হয়েছি। মরহুম সৈয়দ নওয়াব আলী ও সার গজনবী তাঁদের নিজেদের ইচ্ছামতই নাম পরিবর্তনে আপত্তি

১৩. রোকেয়া রচনাবলী, ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২৪৭
১৪. রোকেয়া রচনাবলী, অবরোধবাসিনী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৩৮১

জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমি আমার স্বামীর নামের কাঙ্গাল নই। কারণ আমি জানি তাঁর সত্যিকার স্মৃতি আমার সাথেই রয়েছে ও আমার সাথেই লুপ্ত হয়ে যাবে।'[১৫]

কী বিরূপ পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে কী কঠিন সংকল্প আর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে স্কুল গড়ে তোলার কাজ রোকেয়াকে করতে হয়েছে তা বোঝা যায় রোকেয়ার চাচাতো বোন বেগম মরিয়ম রশীদকে লেখা চিঠি থেকে। তিনি লিখেছেন—

'চিঠি না লিখিবার একমাত্র কারণ সময়াভাব। বুঝিতেই পার এখন খোদার ফজলে পাঁচটি ক্লাস এবং ৭০টি ছোট-বড় মেয়ে, দু'খানা গাড়ী, দুই জোড়া ঘোড়া, সইস, কোচম্যান ইত্যাদি ইত্যাদি সব দিকে একা আমাকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। রোজ সন্ধ্যাবেলা সইসেরা ঠিকমত ঘোড়া মলে কি না তাও আমাকে দেখিতে হয়। ভগিনীরে! এই হাড়ভাঙ্গা গাধার খাটুনী ইহার বিনিময় কি, জানিস? বিনিময় হইতেছে, 'ভাঁড় লিপকে হাত কালা' অর্থাৎ উনুন লেপন করিলে উনুন তো বেশ পরিষ্কার হয়, কিন্তু যে লেপন করে তাহারই হাত কালিতে কালো হইয়া যায়। আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুলভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর।'[১৬]

কিন্তু রোকেয়ার দৃঢ়চিত্ত সংকল্পের সামনে এসব কিছুই শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারেনি। রোকেয়া আরও বলেন,

'বাহিরে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়াছি, ভিতরে যে শুধু ছাত্রীদিগকেই উপযুক্ত শিক্ষাদান করিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহা নয়—সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায়িত্রীদেরকেও ক্রমাগত নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হইয়াছে। স্কুলের জন্য 'জগৎ ছানিয়া কি দিব আনিয়া'—এভাবে প্রাণপণ যত্ন করিয়া মাদ্রাজ, আরা, গয়া, আগ্রা প্রভৃতি স্থান হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।'[১৭]

শুধু তাই নয়। একটা স্কুল পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতাই যেহেতু তাঁর ছিলনা, তাই তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত স্কুলে স্কুলে ঘুরে সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। মিসেস পি. কে. রায় বলেন—

'আমাদের প্রথম সাক্ষাতেই রোকেয়া আমাকে অনুরোধ করলেন যাতে আমাদের বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কর্মপদ্ধতি দেখা ও জানার সুযোগ তাঁকে

---

১৫. রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৫১১

১৬. রোকেয়া রচনাবলী, মরিয়ম রশিদকে লেখা চিঠি (তারিখ-৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৫), বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ.৪৯৯

১৭. রোকেয়া জীবনী-শামসুন নাহার মাহমুদ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা (মার্চ ১৯৯৬) পৃ. ৩৫

দেয়া হয়। সে সময় তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ শুরু করেছিলেন। আজকের আধুনিক নারীদের মতো রীতিসিদ্ধ শিক্ষার সুযোগ তিনি পাননি কিন্তু নারীশিক্ষার সাথে সম্পর্কিত যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের প্রবল ইচ্ছা তাঁর ছিল।'[১৮]

রোকেয়া ছাত্রীদের শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর এ উদ্যোগ অভিভাবকরা আনন্দের সাথে নিতে পারেননি। বরং এ জন্য তাঁকে সমালোচনা শুনতে হয়েছে। একবার তিনি ডাক্তার এনে ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তার রিপোর্ট বাবা-মায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ওই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি লিখেছেন—

'...আমাদের স্কুলের কতিপয় বালিকার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট যখন তাহাদের মাতার নিকট এই অনুরোধসহ গেল যে, 'আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করুন', তাহাতে তাঁহারা চটিয়া এই উত্তর দিলেন— 'স্কুলমেঁ লাড়কী পড়নে কো দিয়া হায়, না বিচার করনে কো, কে, আঁখ্ কমজোর, দাঁত কম-জোর, হলক মে ঘাও হায়, ফেঁফ্ড়া খারাব হ্যায়! ইয়ে সব বোলনে সে হামারী লাড়কী কা শাদী ক্যায়সে হোগা? ইয়ে সব বাৎ রহনে দেঁ, হামারী লাড়কী কো ডাক্তারনীসে না দেখায়েঁ।' ...মেয়ের প্রাণ লইয়া টানাটানি, অথচ শাদীর চিন্তায় মায়ের চোখে ঘুম ধরে নাই! ফল কথা, অশিক্ষিতা মাতার নিকট ইহাপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে?'[১৯]

মাত্র সাতজন বালিকা নিয়ে শত অসুবিধার মধ্যেও তিনি স্কুলে একটি বোর্ডিং হাউজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। *দি মুসলমান* পত্রিকায় এই প্রতিকূল পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন—

'প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে চাই—বিদ্যালয়ের বিবিধ তহবিলে কিছু অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমার সংগৃহীত কিছু পুস্তক হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রির কথা জানিয়ে আপনাদের সংবাদপত্রে প্রায় এক মাস পূর্বে আমি একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলাম। কিন্তু আমাদের কর্ম ও উদ্দেশ্যের প্রতি সম্প্রদায়ের ভাইদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং মনোভাব এমন যে পুরো রমজান

---

১৮. 'When I fIrst met her she asked me if she could watch and find out the inner working of the school. She had herself started a Girls' School at that time and wanted to model her school on efficient lines. She had not got the advantage of a systematic education like the modern girls of the day but she was always keen to learn by watching and studying matters of importance connected with girls' education. (The Mussalman, vol xxvi, Daily Edition, vol 1 No 136- p-5)

১৯. রোকেয়া রচনাবলী, বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি (সভানেত্রীর অভিভাষণ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ.২৩০

মাসে মাত্র ৬ টাকা মূল্যের পুস্তক বিক্রি হয়েছে। ১০২ টাকা মূল্যের *Indian Law Report* এর সমগ্র সংকলনের জন্য আমি মাত্র ৫১ টাকা চেয়েছি যা ওই তহবিলে যাবে, তারপরও আজ পর্যন্ত একজন ক্রেতাও মিলল না। এ লোকেরা একটি মাত্র বালিকা বিদ্যালয়কে পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে না কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা চান। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে সরকার আমাদেরকে বিমুখ করেছেন, কারণ আমরা এর যোগ্য নই। যে কেউ জিজ্ঞেস করতেই পারে যে, কি হবে বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে যখন নারীশিক্ষার মতো অত্যন্ত জরুরি কর্তব্যকে সম্প্রদায় ভীষণ দুঃখজনকভাবে অবহেলা করছে? যদি বা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের হস্তগত হয়, সেটা কি কাজে লাগবে যতক্ষণ আপনাদের বোনেরা অন্ধকারে ডুবে থাকবে? আপনাদের সমাজ থেকে নারীদেরকে নির্বাসিতও করা সম্ভব নয় অথবা পুরাকালের আরবদের মতো কন্যা শিশুদেরকে জীবিত সমাধিস্থ করতেও পারবেন না।'[২০]

রোকেয়া শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান পরিচিতি লাভে ও যোগ-বিয়োগের হিসাব কষে নিত্যদিনের লেনদেন ও সাংসারিক কার্যনির্বাহের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমিত রাখার জন্য স্কুল গড়া কিংবা শিক্ষা আন্দোলন করেননি। কারণ তাঁর আগেই সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ হিন্দু মেয়েদের জন্য ১৮৪৯ সালে বেথুন কলেজ, ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী একটি বিদ্যালয় এবং ১৮৯৭ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম ফেরদৌস মহল কলকাতায় মুসলিম বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এক্ষেত্রে রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেক প্রসারিত, সমাজমুখী ও ইহজাগতিক অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ। তাঁর শিক্ষা আন্দোলনের মাঝে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যমুখীনতার ভাব ও সার্বিক জাগরণের সুর পরিলক্ষিত হয়। ওই সময় মুসলিম নারীদের জন্য কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা বাদ দিয়ে মুসলিম ছেলেদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ প্রতিষ্ঠার যে আগ্রহ মুসলিম সমাজে তৈরি করা হয়েছিল তার মাঝে একদিকে যেমন পুরুষতান্ত্রিকতা অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব প্রচ্ছন্ন ছিল। কোথাও তা প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল। সে সময়ে ভাবনার এই সীমাবদ্ধতা খেয়াল করেই হয়তো রোকেয়া বলেছিলেন—

'ভ্রাতৃগণ মনে করেন, তাঁহারা গোটা কতক আলীগড় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর করিয়াই পুলসিরাত (পারলৌকিক সেতু বিশেষ) পার হইবেন—আর পার হইবার সময় স্ত্রী ও কন্যাকে হ্যান্ডবেগে পুরিয়া লইয়া যাইবেন। ...সুতরাং স্ত্রীলোকদের উচিত যে, তাঁহারা বাক্স-বন্দী হইয়া মালগাড়ীতে বসিয়া সশরীরে স্বর্গলাভের আশায় না থাকিয়া স্বীয় কন্যাদের সুশিক্ষায় মনোযোগী হন।'[২১]

২০. রোকেয়া রচনাসংগ্রহ-ডঃ মীরাতুন নাহার, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা (৯ ডিসেম্বর ২০০১) পৃ. ৫৩০
২১. রোকেয়া রচনাবলী-বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি (সভানেত্রীর অভিভাষণ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সমাজে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার অবিরাম দ্বন্দ্বের বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। প্রচলিত ব্যবস্থাকে আঘাত না করে পাল্টানো যায় না। আবার আঘাত করতে গেলে প্রত্যাঘাতও সইতে হয়। তবে ইতিহাসের গতিপথে প্রগতির জয় এবং প্রতিক্রিয়ার পরাজয়ই নিশ্চিত হয়ে আছে। তা না হলে চেতনাসম্পন্ন মানুষ ও মানুষের সমাজ আদিম বন্য গুহাদশা থেকে আধুনিক নগর জীবনের এ স্তরে উঠে আসতে পারত না। রোকেয়া বলতেন—

> 'যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে; যেন নিন্দা-গ্লানি, উপেক্ষা-অপমান কিছুতেই তাহাকে আঘাত করিতে না পারে; মাথার খুলিকে এমন মজবুত করিয়া লইতে হইবে, যেন ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ সকলই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।'[২২]

বিরুদ্ধ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে তিনি বলছেন—

> 'আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর, সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি; উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি।'[২৩]

রোকেয়ার নারীস্বাধীনতার ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নারীশিক্ষা এবং সেজন্য স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি জানতেন, তদানীন্তন মুসলিমসমাজের সকল রকম ধর্মীয় সংস্কার ও আচার-বিচারের বিরুদ্ধে লড়তে হলে ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে হবে, অনেক অযৌক্তিক বিধিও মানতে হবে। এ না হলে তিনি সাধনায় সফল হতে পারবেন না। তথাকথিত সমাজপতিরা এবং মৌলবাদীরা তার চলার পথের সামনে বাধার দেয়ালটা আরো উঁচু করে দেবে। এ উপলব্ধি থেকেই অসীম তেজস্বী এ নারী আত্মপীড়নেও পিছিয়ে যাননি।

স্কুলের জন্য নিজের বিশ্বাস এবং স্বাচ্ছন্দ্যের বিপরীতে আত্মপীড়ন তিনি মেনে নিয়েছিলেন সহজভাবে। *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন রোকেয়ার সাথে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে লিখেছেন—

> 'তিনি (রোকেয়া) এতক্ষণ ভিতরে থেকেই কথা বলছেন। জিজ্ঞেস করলাম: আপনি প্রগতিপন্থী মহিলা অথচ পর্দার ভিতরে থেকেই কথা বলছেন? তিনি বললেন : পর্দা অবরোধ নয়, কিন্তু আমি যে অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে অবরোধবাসিনী হয়েছি, তার কারণ অনেক। আমার

(ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ.২৩০

২২. বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য-মোতাহের হোসেন সুফী, সুর্বণ, ঢাকা (এপ্রিল ২০০১) পৃ. ৫৪

২৩. রোকেয়া রচনাবলী, অবরোধবাসিনী (নিবেদন), বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ.৩৮১

স্কুলটা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি সমাজের অযৌক্তিক নিয়মকানুনগুলিও পালন করছি।'[২৪]

প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ তাঁর *বাতায়ন* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

'একটি বন্ধুর মেয়েকে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুলে পড়তে দেবার প্রস্তাব নিয়ে একদিন মিসেস আর এস হোসেন ওরফে বেগম রোকাইয়া খাতুন সাহেবার কাছে গেলাম। তিনি আমার খবর পেয়েই চলে এলেন, কিন্তু বসলেন পর্দার আড়ালে। আমি বিস্ময়বোধ করলাম। যিনি কর্মজীবনের প্রথম হতে অবরোধের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে এসেছেন, তিনি এতো বুড়ো বয়সে এ পর্দার আয়োজন করলেন কেন? ভর্তি সম্পর্কে আলাপ শেষ করেই বললেন, 'শুনুন প্রিন্সিপাল সাব, আমি কিন্তু আপনার সামনে পর্দা করলাম।'

'সে তো দেখছিই। আর পর্দা করা জায়েজও বটে।'

'নিঃসন্দেহে জায়েজ। আমি অবরোধের বিরুদ্ধে কলম চালিয়ে আসছি, পর্দার বিরুদ্ধে নয়, তবে আমার এই বয়সে পর্দা না করলেও চলে।'

'তাই মনে হয়।'

'তবু পর্দা করছি কেন জানেন? বুড়ো হয়ে গেছি, মরে যাব। স্কুলটা এতদিন চালিয়ে এলাম, আমার মরার সঙ্গে সঙ্গে এও যদি মরে সেই ভয়ে।'[২৫]

বেগম রোকেয়ার ভাগ্নে উচ্চপদে আসীন আবদুল করিম গজনবীর কাছে স্কুলটি রক্ষার আবেদন জানাতে গেলে তিনি খালা রোকেয়াকে পর্দা মানার শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইব্রাহিম খাঁ বলেন—

'গজনবী... সেই মরণমুখী বৃদ্ধার উপর শর্ত জারি করলেন দিনের আলোর অন্তরালে যেতে হবে। পরদা করতে হবে। অনেকের পক্ষে এ হয়তো সহজ ছিল। কিন্তু জীবনভর যিনি কথায়, কলমে, আচরণে নারীর মুক্তি প্রচার করে এসেছেন, তার পক্ষে এ কতবড় কঠিন ত্যাগ ছিল, তা তিনিই জানতেন। হয়তো তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, বিদ্রোহী আত্মাকে হয়তো তিনি বলেছিলেন, থামরে তুই থাম। আমাকে যেতে দে আলোর রাজ্য হতে সরে, তবু স্কুলটা বেঁচে থাক। স্কুল বাঁচলে ওর থেকে হাজার হাজার মুক্তবুদ্ধি নারী বেরিয়ে যখন আলো ঝলমল আকাশের তলে দাঁড়াবে তখন কেউ তাদের অবরোধের আড়ালে যাবার কথা বলতে সাহস পাবে না।'[২৬]

চিরকাল নারীস্বাধীনতার জন্য কিছু করবার চেষ্টায় রত রোকেয়ার কোনো সংসারবন্ধন ছিল না, ছাত্রীরাই ছিল তাঁর সাধনার সন্তান। এদের নিয়েই ছিল

২৪. বেগম রোকেয়া-আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ১৯৮৩) পৃ.১১৬- ১১৭
২৫. বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য-মোতাহের হোসেন সুফী, সুর্বণ, ঢাকা (এপ্রিল ২০০১) পৃ. ৩৮
২৬. বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য-মোতাহের হোসেন সুফী, সুর্বণ, ঢাকা (এপ্রিল ২০০১) পৃ.৩৮

তাঁর স্বপ্নের বিস্তার। সেজন্য কোনো বাধাই তাঁর কাছে বাধা মনে হয়নি। তিনি বলেছেন—

> 'একটা মজার কথা এই যে, স্কুলের জন্য আমি পার্থিব যে কোনো জিনিসের প্রতি নির্ভর করিয়াছি, আল্লাহ আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, আমার মাতা সঙ্গে না থাকিলে আমার কলিকাতা থাকা হইবে না। কিন্তু বৎসর অতীত হইতে না হইতে মাতার মৃত্যু হইল। পরে ভাবিয়াছিলাম টাকা না থাকিলে স্কুল চলিবে না; কিন্তু বিদ্যালয় খুলিবার আট মাস পরেই বার্ম্মা ব্যাঙ্ক ফেল হইল, অতঃপর আরও নানা কারণে একুনে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা নষ্ট হইল। তাহার পরে ভাবিয়াছিলাম কলিকাতায় কতিপয় গণ্যমান্য রইসের সাথে মিলিয়া মিশিয়া না থাকিলে বিদ্যালয়সহ কলিকাতায় টিকিয়া থাকিতে পারিব না; কিন্তু সেই গণ্যমান্য লোকেরাও বিমুখ হইয়া দাঁড়াইলেন। সবই গিয়াছে কেবল বিধাতার কৃপায় স্কুল আছে। শুধু কঙ্কালসার হইয়া প্রাণে বাঁচিয়া থাকা নহে—বিদ্যালয় আরম্ভ করিয়াছিলাম মাত্র দু'খানা বেঞ্চ ও আটজন ছাত্রী লইয়া অলিউল্লাহ লেনের একটি ছোট বাড়িতে, এখন স্কুলের প্রায় ঝাড়া আঠার উনিশ হাজার টাকার আসবাব এবং নগদ বিশ হাজার টাকা আছে, ছাত্রী সংখ্যাও শত্রুর মুখে ছাই দিয়া দেড়শত।'[২৭]

শুরু থেকে অদম্য সাহস এবং নিষ্ঠায় শিক্ষাব্রতী হিসেবে যে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন তা চতুর্দিক থেকে যেমন প্রচণ্ড বিরোধিতা ও অসহযোগিতার মুখে পড়েছিল, তেমনি দিনে দিনে বহু শিক্ষিত সজ্জনের প্রশংসাও কুড়িয়েছিলেন। ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী সরোজিনী নাইডু সুদূর হায়দারবাদ থেকে ১৯১৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর লিখিত এক চিঠিতে রোকেয়ার মহৎ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করে বলেন—

> '...কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি, আপনি কি দুঃসাহসের কাজ করিয়া চলিয়াছেন। মুসলমান বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আপনি যে কাজ হাতে নিয়াছেন এবং তাহার সাফল্যের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী যে ত্যাগ সাধনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আপনার প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যেই এই চিঠিখানা লিখিলাম।'[২৮]

দৃঢ়চিত্ত প্রজ্ঞাবান দূরদর্শী এই নারীর অফুরন্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে ১৯২৭ সালে তার স্কুল উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণতি পেল। আজ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় লর্ড সিনহা রোডে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক

২৭. বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য-মোতাহের হোসেন সুফী, সুর্বণ, ঢাকা (এপ্রিল ২০০১) পৃ. ৫০
২৮. বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য-মোতাহের হোসেন সুফী, সুর্বণ, ঢাকা; (এপ্রিল ২০০১) পৃ. ৪৪

স্কুল একটা অন্যতম খ্যাতিমান বিদ্যালয় হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

মাত্র ৫২ বছর বয়সে ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২ সালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন। একই বছর ২৪ সেপ্টেম্বর বীরকন্যা প্রীতিলতা মাত্র ২২ বছর বয়সে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাহুতি দেন। রোকেয়া মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তার কোনো এক ছাত্রীকে বলেছিলেন—

> 'মা, সময় বুঝি হইয়া আসিল। মরণের বোধহয় আর বেশী দেরী নাই।... এইবার ছুটি নিতে ইচ্ছা হয়। সত্য সত্যই জীবনের কুন্দকুসুম যেদিন ঝরিয়া পড়িবে সেদিন আমার শেষ বিশ্রামস্থল রচনা করিও আমার প্রাণের এই তাজমহলের একপাশে—কবরে শুইয়াও যেন আমি আমার মেয়েদের কলকোলাহল শুনিতে পাই।'[২৯]

কিন্তু রোকেয়ার সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। কলকাতার উপকণ্ঠ সোদপুরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। রোকেয়ার মৃত্যুর পর কলকাতা গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মিসেস পি. কে. রায় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলবার্ট হলের স্মৃতিসভায় সাহিত্যিক সমাজের পক্ষ থেকে হাবিবুল্লাহ বাহার মর্মস্পর্শী আবেদনে বলেন—

> 'আজিকার বেদনা-উৎসবে সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণ পর্যন্ত সকলেই সমবেত হইয়াছে। একটি অবলা নারীর মৃত্যু আজ এতগুলি লোককে একত্রে মিলিত করিয়াছে। জাতি যে আজ জাগ্রত, ইহাতে একথাই প্রমাণিত হয়। সভায় অনেকে অনেক কিছু বলিলেন। রোকেয়ার যে সকল গুণ ও কার্যাবলির কথা তাঁহারা উল্লেখ করিলেন তাহার প্রত্যেকটিই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কী, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জাতি তাঁহাকে কি প্রতিদান দিয়াছে? তাঁহার জীবনব্যাপী ত্যাগের ফলে সমাজের নিকট হইতে তিনি কী পাইয়াছেন? পাইয়াছেন অশ্রাব্য নিন্দা ও অকথ্য লাঞ্ছনা। এতবড় সভায় আজ কে আছে, একথার প্রতিবাদ করিবে? এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকটি মানুষ আজ আপনার বুকে হাত দিয়া বলুন একদিন নয়, দুদিন নয়, দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পলে পলে কাহারা তাঁহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে? জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাহারা তাঁহাকে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া চলিয়াছিল। তাঁহারা বলিতে পারেন কি, রোকেয়ার মৃত্যুতে আজ শোক প্রকাশ করিবার তাঁহাদের কী অধিকার?'[৩০]

আলবার্ট হলের শোকসভায় রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দিন যখন গাইছিলেন—

---

২৯. ছৈয়দা রোকেয়া সুলতান, অন্ধকার যুগে আলো-রোকেয়া; সওগাত মহিলা সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫২, পৃ. ১০৯
৩০. বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য-মোতাহের হোসেন সুফী, সুর্বণ, ঢাকা (এপ্রিল ২০০১) পৃ. ২৯

'কোন কাঁদনের ঢেউ ওঠে আজ আসমানেরি দরিয়ায়।
বেদন বাজে তারায় তারায় চাঁদ সুরুজ আর জোছনায়
শীতের তুহিন পরদা ঠেলে এলো এ কোন্ পূর্ব হাওয়া।
নিবিয়ে ধরায় শিয়রে দীপ, কাঁদায় আকুল ব্যাথায়।'

তখন গোটা হলে অশ্রুর বন্যা বয়ে গিয়েছিল।

অবস্থার পরিবর্তন কতটুকু?

ঊনিশ শতকের শুরুর দিকে হিন্দুসমাজে স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে তার এক বা একাধিক স্ত্রীকে স্বামীর সাথে চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে ধূম্রকুণ্ডলী পাকিয়ে স্বর্গারোহণের অমানবিক ধর্মতত্ত্ব ও পাশবিকতার নির্মম চিত্রের বিরুদ্ধে রামমোহন যখন লড়ছিলেন তখন মুসলিমসমাজে স্বামীর সাথে সংসারকালে এবং তার মৃত্যু পরবর্তীকালে অবরোধবাসিনী নারীরা শারীরিকভাবে জীবনধারণ করে গেলেও তাদের মানসিক মৃত্যু আগেই ঘটে যেত। রোকেয়াও সেই সত্য অনুধাবন করেছিলেন বলেই বলতে পেরেছেন—

> 'যদিও ইসলাম ধর্ম কন্যাদের শারীরিক হত্যা নিবারণ করেছে, তবুও মুসলিমগণ অদ্যবধি ঘরের চৌকাঠে নারীদের বন্দী রেখে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে তাদের মন, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি বধ করে চলছেন।'

আরও বলেছেন—

> 'অবরোধ-প্রথাকে প্রাণঘাতক কার্ব্বলিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়। যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্ব্বলিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না! অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।'[৩১]

সেই খেদ থেকে তিনি দুঃখ করে বলেন—

'কেন আসিলাম হায়! এ পোড়া সংসারে।
কেন জন্ম লভিলাম পর্দানশীন ঘরে।'[৩২]

কৌশলগত অবস্থান থেকে পর্দা মেনে চললেও অবরোধ প্রথার ঘোরতর বিরোধী রোকেয়া 'কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না' নিয়ে *অবরোধবাসিনী* রচনা করেন। ভূমিকায় তিনি বলেন—

> 'আমরা বহুকাল হইতে অবরোধে থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি।

৩১. রোকেয়া রচনাবলী, বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি (সভানেত্রীর অভিভাষণ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২২৯
৩২. রোকেয়া রচনাবলী, অবরোধবাসিনী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৪১৪

সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের বিশেষতঃ আমার কিছুই নাই। মেছোনীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, 'পঁচা মাছের দুর্গন্ধ ভাল না মন্দ?' সে কি উত্তর দিবে? ... গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষের বিরুদ্ধে নহে, মেয়ে মানুষদের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ীর চাকরানী ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোক দেখিতে পায় না। বিবাহিতা নারীগণও বাজীকর-ভানুমতি ইত্যাদি তামাসাওয়ালী স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পর্দ্দা করিয়া থাকেন। যিনি যত বেশী পর্দ্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশী পেঁচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই তত বেশী শরীফ। ...অনেক দিনের কথা— রংপুর জিলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ নামক গ্রামের জমীদার বাড়ীতে বেলা আন্দাজ ১টা-২টার সময় জমীদারকন্যাগণ জোহরের নামাজ পড়িবার জন্য ওজু করিতেছিলেন। সকলের ওজু শেষ হইয়াছে কেবল 'আ' খাতুন নাম্নী সাহেবজাদী তখনও আঙ্গিনায় ওজু করিতেছিলেন। আলতার মা বদনা হাতে তাঁহাকে ওজুর জন্য পানি ঢালিয়া দিতেছিল। ঠিক সেই সময় এক মস্ত লম্বাচৌড়া কাবুলী স্ত্রীলোক আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত। হায়, হায়, সে কি বিপদ! আলতার মার হাত হইতে বদনা পড়িয়া গেল। সে চেঁচাইতে লাগিল 'আউ আউ! মরদটা কেন আইল!' সে স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, 'হেঁ মরদানা! হাম্ মরদানা হায়?' সেইটুকু শুনিয়াই 'আ' সাহেবজাদী প্রাণপণে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া তাঁহার চাচী আম্মার নিকট গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ও কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, 'চাচী আম্মা! পায়জামা পরা একটা মেয়ে মানুষ আসিয়াছে!!' কর্ত্রী সাহেবা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে তোমাকে দেখিয়াছে?' 'আ' সরোদনে বলিলেন 'হাঁ'। অপর মেয়েরা নামাজ ভাঙ্গিয়া শশব্যস্তভাবে দ্বারে অর্গল দিলেন—যাহাতে সে কাবুলী স্ত্রীলোক এ কুমারী মেয়েদের দেখিতে না পায়। কেহ বাঘ ভালুকের ভয়েও বোধ হয় অমন করিয়া কপাট বন্ধ করে না।'[৩৩]

আরেকটি ঘটনা—

'কয়েক ঘর বঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত জমীদারের মাতা, মাসী, পিসী, কন্যা ইত্যাদি একত্রে হজ্ব করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় ২০/২৫ জন ছিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছিলে পর সঙ্গের পুরুষ প্রভুগণ কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছিলেন। বেগম সাহেবাদিগকে একজন বিশ্বস্ত আত্মীয় পুরুষের হেফাজতে রাখা হয়। সে ভদ্রলোকটিকে লোকে হাজী সাহেব বলিত, ...হাজী সাহেব বেগম সাহেবাদের ওয়েটিং রুমে বসাইতে সাহস পাইলেন না। তাঁহার উপদেশমতে বিবি সাহেবারা প্রত্যেকে মোটা মোটা কাপড়ের বোরকা পরিয়া স্টেশনের প্লাটফরমে উবু হইয়া (squat)

৩৩. রোকেয়া রচনাবলী, অবরোধবাসিনী (ভূমিকা ও এক নম্বর গল্প) বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৩৮৫

বসিলেন। হাজী সাহেব মস্ত একটা মোটা ভারী শতরঞ্জি তাঁহাদের উপর ঢাকিয়া দিলেন। তদবস্থায় বেচারীগণ এক একটা বোচকা বা বস্তার মত দেখাইতেছিলেন। ...ট্রেন আসিবার সময় জনৈক কর্মচারী ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে হাজী সাহেবকে বলিলেন, 'মুন্সি! তোমারা আসবাব হিয়াসে হাটা লো। ...প্লাটফরম পর খালি আদমি রহেগা—আসবাব নেহি রহেগা।' হাজী সাহেব জোড়হস্তে বলিলেন, 'হুজুর, ঐ সব আসবাব নাহি—আওরাত হায়।' কর্মচারীটি পুনরায় একটা 'বস্তায়' জুতার ঠোকর মারিয়া বলিলেন, 'হাঁ, হাঁ—এইসব আসবাব হাটা লো।' বিবিরা পর্দার অনুরোধে জুতার গুতা খাইয়াও টুঁ শব্দটি করেন নাই।'[৩৪]

এ ধরনের আরও অনেক কাহিনি লঘু পরিহাস ঢঙে উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সামাজিক পীড়নে পিষ্ট নারীদের জীবনহীন জীবনীর বেদনাবিধূর মর্মান্তিক খণ্ডচিত্র বিবেকের দুয়ারে তিনি হাজির করতে চেয়েছেন। রোকেয়ার সময় পার হয়ে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেও কি অবস্থার তেমন গুণগত পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি?

এক মহা গৌরবের সংগ্রামী ঐতিহ্য আর বিশাল প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৭১ সালে সংগঠিত হয়েছিল সশস্ত্র মহান মুক্তিযুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ মানুষের বীরোচিত আত্মদানে এবং অর্ধেক জনসংখ্যা নারীসমাজের শৌর্যমণ্ডিত লড়াই এবং অবর্ণনীয় নির্যাতন আর সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মরণপণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। সেদিন অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীসমাজ শুধু নির্যাতনই সহ্য করেনি, পুরুষদের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সংগ্রামের এক বীরোচিত অধ্যায়ও রচনা করেছিল। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে হাজার হাজার নারীর ডামি রাইফেল উঁচিয়ে শত্রু মোকাবেলার রাজপথ কাঁপানো সদম্ভ প্রস্তুতিমূলক মিছিলের ছবি আজও আমাদের প্রেরণা জোগায়। অনুভূতিতে শিহরণ জাগায়। এই স্মৃতি যুগ যুগ ধরে আমাদের নারীসমাজের শৌর্যের মূর্তি ও সংগ্রামের বীরগাথা প্রকাশ করে যাবে। আমাদের পূর্বসূরি নারীজাগৃতি আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই উজ্জ্বল তারকা, বেগম রোকেয়া ও প্রীতিলতা। নবজাগরণের পতাকাবাহী বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী বীর শহিদ প্রীতিলতা (১৯১১-১৯৩২) বাংলাদেশের রংপুর ও চট্টগ্রামের সন্তান। আমরা তাঁদের উত্তরসূরি, তাঁদের শিক্ষা-সংগ্রাম আমাদের প্রেরণা, আমাদের গর্ব। অথচ স্বাধীনতার ৪০ বছর[৩৫] পর আমরা কোন্ প্রত্যাশার কী পরিণতিতে এসে দাঁড়ালাম? পাকিস্তানি হানাদারদের দ্বারা দুই লাখ মা-বোনের নির্যাতনের কথা বলতে বলতেই স্বাধীন দেশে ২০ লক্ষাধিক নারী

---

৩৪. রোকেয়া রচনাবলী, অবরোধবাসিনী (তিন নম্বর গল্প) বাংলা একাডেমী (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৩৮৬-৩৮৭
৩৫. ২০১৯ সাল অনুসারে ৪৮ বছর।

লোমহর্ষক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে। লক্ষ লক্ষ নারী বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। কিশোর-তরুণ বয়সী ছেলেদের নাম হয়েছে বখাটে আর তাদের উপদ্রবে তাদের কিশোরী বোনেরা, মায়েরা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। যৌতুকের বলি, গণধর্ষণের শিকারসহ ঘরেবাইরে নানা উৎপীড়ন, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন এমন মাত্রায় পৌঁছেছে যে উৎকণ্ঠার বাইরে কোনো নারীর পক্ষে স্বাভাবিক জীবনযাপন কল্পনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর শোষিত জনগণের প্রকৃত নেতৃত্ব না থাকায় উঠতি বাঙালি ধনিকশ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে। সেখান থেকে সূচনা হয় আমাদের জাতীয় ও জনজীবনে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকা দুর্দশা, অবক্ষয়, শোষণ-লুণ্ঠন আর নতুন মাত্রায় নারী নির্যাতন।

নারীনির্যাতন কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তা বোঝা যাবে একটি বছরের চিত্র থেকে। ২০০৫ সালে ৫৪ হাজার ৯৫৪ জন নারী বিভিন্ন নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে নিহত ২ হাজার ৬৩৪ জন, থানায় মামলা ২ হাজার ২৫৭টি, ৩৬৯টি মামলার রায় হয়েছে, বিভিন্ন মেয়াদে গ্রেফতার ২ হাজার ১১ জন। ধর্ষণের পর চুল, হাত, আঙুল, নাক, স্তন কেটে, চোখ উপড়ে ফেলে নারীদের উপর নির্যাতন হয়েছে। ধর্ষিতার নগ্ন ছবি উঠিয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৪ জন শিশু যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে। পাচার হয়েছে অসংখ্য। এছাড়া যৌতুকের জন্য মারধর, গলাটিপে হত্যা, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা, এসিড নিক্ষেপ করে ঝলসে দেয়া, বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলা, স্ত্রীর কাঁধে হালের লাঙলের জোয়াল তুলে দিয়ে চাষ করানো, স্ত্রীর পিঠে ধান ভাঙ্গিয়ে মাড়াই করা, নারীদের গোয়ালঘরে বন্দি করে গরুর সঙ্গে আটকে রাখা, ঘুমন্ত অবস্থায় জবাই করে হত্যা, জিহ্বা কেটে দেয়াসহ অসংখ্য লোমহর্ষক ঘটনা ঘটছে।[৩৬] ২০১০ সালে ধর্ষণ, গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ২ শত ৪৮ জন নারী এবং ৩০৮ জন মেয়েশিশুসহ মোট ৫৫৬ জন। এদের মধ্যে ৬১ জন নারী ও ৩০ জন মেয়েশিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৮৭ জন নারী ও শিশু যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ২৪৩ জনকে যৌতুকের জন্য হত্যা করা হয়েছে এবং ২২ জন নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। যৌনহয়রানির শিকার হয়েছে ৩২৬ জন নারী। এদের মধ্যে ৭ জন বখাটেদের হাতে খুন হয় এবং ২৫ জন আত্মহত্যা করে, ১২৯ জন লাঞ্ছিত ও ৫ জন অপহৃত হয়। এ বছরে এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছে ৮৪ জন নারী ও ১৬ জন মেয়ে শিশু।[৩৭]

---

৩৬. *দৈনিক যুগান্তর*, ৫ জানুয়ারি ২০০৬; নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক তথ্য কেন্দ্র ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএসসি) এর উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত তথ্য

৩৭. বার্ষিক রিপোর্ট-২০১০, *অধিকার*

বেগম রোকেয়ার জীবন ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষা এ জাতির ভাবমানসে বিস্তার ঘটানো গেলে এবং মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা সমাজমূলে গ্রথিত করা গেলে আজকের এই পরিণতিতে আমাদের এসে দাঁড়াতে হতো না।

সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা আন্দোলনের পটভূমি

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে তৎকালীন বঙ্গদেশ ইংরেজদের দখলে যাওয়ার ৮/১০ বছরের মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটেছিল। তখন থেকে একদিকে যেমন ইংরেজ দখল সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃত হচ্ছিল তেমনি বিদ্রোহের লেলিহান শিখাও সমভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কৃষক আন্দোলনের পাশপাশি বোম্বে, কলকাতাকেন্দ্রিক শ্রমিক আন্দোলনও দানা বেধে ওঠে। তারই এক মধ্যবর্তী সময়ে ১৮৫৮ সালে সংগঠিত হয় মহাবিদ্রোহ যার মধ্যে স্বাধীন জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সমৃদ্ধ উপাদান মিশ্রিত ছিল। মঙ্গল পাণ্ডেসহ অসংখ্য বীর সৈনিকের শহিদি আত্মদানের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে, যেমন করে দাঁড়িয়ে আছে ঢাকায় বাহাদুর শাহ পার্কের স্মৃতিস্তম্ভ। ওই সময় থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকি শাসনের বদলে রাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বাংলাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সমাজে নবজাগরণের এক ঢেউ তুললেন রামমোহন। সামন্তীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবমানসে, আচার-বিশ্বাসে আচ্ছন্ন মানুষের মনে-মগজে স্বাধীনতার বোধ চৈতন্য সৃষ্টি হতে পারে না, সাম্প্রদায়িক কূপমণ্ডূকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় চেতনা ও মানব ঐক্যের বন্ধনে মিলন ঘটতে পারে না। তাই রামমোহনের শুরু করা ধর্মীয় এবং সমাজসংস্কার আন্দোলনকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর টেনে নিয়ে গেলেন ইহজাগতিক মানবতাবাদী শিক্ষা বিস্তার ও বর্ধিত মাত্রায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে। আর অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনে দেখা দিয়েছিল কতিপয় ইংরেজি জানা কেরানিকূল তৈরি করা। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—

> ‘পরাজিতের জন্য এমন শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্বনাশের জন্যই তৈরি করিয়ে দেবে? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতের বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকিল, মোক্তার, মুন্সেফ, হুকুম মত জেলে দিতে ডেপুটি, সাব ডেপুটি, ধরে আনতে থানায় ছোট-বড় পিয়াদা,- ইস্কুলে ডুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মাস্টার, কলেজে ভারতের হীনতা ও বর্বরতার লেকচার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসর, অফিসে খাতা লিখতে জীর্ণ-শীর্ণ কেরানী, তার শিক্ষা বিধান এর বেশী দিতে পারে এও যে আশা

করতে পারে, সে যে পারে না কি আমি তাই শুধু ভাবি।'[৩৮]

মুসলমানেরা ইংরেজিকে বিজাতীয় এবং বিধর্মীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করে তা বর্জন করে অন্যদিকে হিন্দুরা কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে তাতে অংশ নেয়।

ইংরেজ শাসকেরা ধর্মীয় বিশ্বাসে বিভাজিত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়কে পরস্পর থেকে দূরত্বে ঠেলে দিয়ে নিজেদের করায়ত্তে রাখতে চেয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই মূলত ওয়ারেন হেস্টিং ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসা এবং জোনাথান ডানকান ১৭৯১ সালে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসাশিক্ষাকে ব্রিটিশ পরিকল্পনার ছাঁচে পরিচালিত করতে পারলেও সংস্কৃত কলেজে তাদের মনমতো শিক্ষাক্রম রামমোহন-বিদ্যাসাগরদের বিরোধিতার মুখে কার্যকর করতে পারেননি। যেমন, ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টসকে লেখা এক পত্রে রামমোহন বলেছিলেন—

> 'যদি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের অসার বিদ্যার পরিবর্তে বেকনের প্রবর্ত্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হইতে না দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই অজ্ঞতাকে বহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গবর্নমেন্টের আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎপরিবর্তে এদেশীয়দিগের উন্নতিবিধান যখন গবর্নমেন্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে উন্নত ও উদার রীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্বারা অপরাপর বিষয়ের সহিত গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থান-বিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ এখন প্রস্তাবিত কার্য্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে, তদ্বারা ইউরোপে শিক্ষিত কতিপয় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ও ইংরেজি শিক্ষার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করিলে ও তৎসঙ্গে পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।'[৩৯]

লর্ড ভ্যালেন্টাইনের সুপারিশের তীব্র সমালোচনা করে বিদ্যাসাগর শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলেন—

> 'বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হয়। ...কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্তদর্শন সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই। ...তবে এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। তার প্রতিষেধক হিসেবে

---

৩৮. শিক্ষার বিরোধ-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎরচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা (নভেম্বর ২০১৬) পৃ. ৯৫৫

৩৯. The Life and letter of Raja Rammohan Roy, S.D. collection, p. 460

ছাত্রদের ভাল ভাল ইংরেজী দর্শনের বই পড়ানো দরকার।'[৪০]

শুধু তাই নয়, তিনি লর্ড ভ্যালেন্টাইনের প্রস্তাব সংস্কৃত কলেজে অনুমোদন করেননি। এক্ষেত্রে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো জ্ঞানপিপাসু শিক্ষাব্রতী দেশপ্রেমিক মানুষের আবির্ভাবের কারণে ইংরেজদের ইংরেজি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য একদিকে যেমন উন্মোচিত হয়, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তৃত জগতের সাথে তাদের পরিচয়ও ঘটতে থাকে।

সামন্তীয় মুসলিম শাসকদের হাত থেকে ইংরেজরা ক্ষমতা দখলে নেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠী ক্ষুব্ধ এবং বৈরী মনোভাবাপন্ন ছিল। এটা ছিল স্বাভাবিক, কারণ তারা মোগল এবং মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য দেখেনি। এদের কাছে ইংরেজদের ধর্মীয় পরিচয় হল খ্রিষ্টান আর ইংরেজি ভাষা হয়ে দাঁড়ালো খ্রিষ্টানের ভাষা। তাই তা পরিত্যাজ্য। আরবি, ফার্সি জ্ঞান নিয়ে মুসলিমরা বাস্তবে সকল রাষ্ট্রীয় ও লাভজনক কার্যক্ষেত্র থেকে অপসারিত হয়। এইভাবে অজ্ঞানতার অন্ধকার এবং দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে তারা অতীতমুখীতা ও ধর্মান্ধ কুসংস্কারকে তাদের ঐতিহ্য ও অবলম্বন হিসেবে বেশি করে আঁকড়ে ধরে। রোকেয়া তাঁর এক ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন—

> 'এখনও আমার সম্মুখে আমাদের স্কুলের কয়েকটি ছাত্রীর অভিভাবকের পত্র মজুত আছে—যাহাতে তাহারা লিখিয়াছেন যে, তাহাদের মেয়েদের যেন সামান্য উর্দু ও কোরান শরীফ পাঠ ছাড়া আর কিছু—বিশেষতঃ ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া না হয়।'[৪১]

রামমোহনের চেয়ে ১৩ বছর কনিষ্ঠ আবদুল রহীম দাহরি ও তার মুষ্টিমেয় দু-একজন শিষ্য মিলে ইহজাগতিক অগ্রসর চিন্তা নিয়ে মুসলিমসমাজে যে বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব সম্পাদন করতে চাইলেন তা সফল হয়নি। ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতার অন্ধকার ভেদ করে মুসলিমসমাজে তাঁরা আলো জ্বালাতে পারেননি। তারপর সৈয়দ আহমদ, নবাব আব্দুল লতিফ, দেলওয়ার হোসেন আহমদ ও বিচারপতি সৈয়দ আমির আলী প্রমুখরা ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের পিছিয়ে পড়া দশা কাটানোর যে শিক্ষা আন্দোলন রচনা করলেন তা সুবিধালাভের গণ্ডি অতিক্রম করে বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনের স্তরে উঠলো না। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের রেনেসাঁ আন্দোলনের বিশাল প্রভাব সত্ত্বেও মুসলিমসমাজকে ভিতর থেকে নাড়িয়ে জাগিয়ে তুলতে পারেনি; আবদুল রহীম দাহরির ইহজাগতিকতা সমৃদ্ধ চিন্তাও মুসলিমসমাজে জায়গা করে নিতে

৪০. বিক্ষত বিদ্যাসাগরের নির্বেদ ও নৈরাশ্য : আলী আনোয়ার; মিজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা, বিদ্যাসাগর সংখ্যা, ১৯৯৭; পৃ. ১৮-১৯

৪১. রোকেয়া রচনাবলী, বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি (সভানেত্রীর অভিভাষণ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ.২২৭

পারেনি। আর সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমির আলীদের শিক্ষা আন্দোলন ছিল সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ। ইতিহাসের ওই সময়টাতে জাতীয়তাবাদী-গণতান্ত্রিক চিন্তা বিকাশের পীঠস্থান ছিল কলকাতা তথা বাংলা যেখানে রেনেসাঁর পতাকা নতুনভাবে তুলে ধরে বিশেষ করে মুসলিমসমাজের আলোড়ন সৃষ্টি করে নবজাগরণের অগ্রদূত হয়ে রইলেন বেগম রোকেয়া—কাজী নজরুল ইসলাম যাঁর যোগ্য উত্তরসূরি।

মুসলিমদের মধ্যে দেশপ্রেম-দেশাত্মবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা, আধুনিকতা, কূপমণ্ডূকতা-কুসংস্কারমুক্ত সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তনের অংশ হিসেবে শিক্ষাবিস্তারের মনোভাব প্রথম লক্ষ্য করা যায় রোকেয়ার মধ্যে। ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি (Bengal Women's Educational Conference) সম্মিলনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন—

> '২০/২১ বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজ সেবা করিয়া ...যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি ...স্ত্রী শিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া পড়ে।'

এই সম্পর্কে তিনি 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে বলেন—

> '...শিক্ষার অর্থ কোনো সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের অন্ধ অনুকরণ নহে। ...আমরা কেবল পাশ করা বিদ্যাকে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি, কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জল মিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ্ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা—বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ (opal), কর্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুত করণোপযোগী মৃত্তিকা, অথবা নীলকান্তমণি; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক! এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার! দেখিলেন, ভগিনী! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দ্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা মানিক দেখে।'

তিনি আরও বলেন—

> 'শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি, গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা—যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে। ...শিক্ষা—মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ী, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আইসে নাই; বরং তাহারা বিশেষ

> কর্তব্য সাধনের নিমিত্ত নারী রূপে জন্মলাভ করিয়---াছে। ...শারীরিক শিক্ষার জন্য আমার মতে লাঠি ও ছোরা খেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা, যাঁতায় আটা প্রস্তুত করা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া প্রশস্ত।'[৪২]

স্কুল সম্পর্কে রোকেয়ার মনোভাব আমরা দেখতে পাই তাঁর রচনায় উল্লেখিত বক্তব্যে,

> 'ছাত্রীদিগকে দুই পাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। ...মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করাইয়া ছাত্রীদিগকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না।'[৪৩]

শিক্ষা তথা জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> '...টাকা উপার্জন করাই যে শিক্ষালাভের মূল উদ্দেশ্য, ইহা আমি কোনোকালেই স্বীকার করি নাই। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য : মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা। আবার কেবল বিএ, এমএ পাশ করিলেও অনেক স্থলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না।'

বেগম রোকেয়া প্রাচ্যের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করা কিংবা পাশ্চাত্য শিক্ষার হুবহু অনুকরণ করা কোনোটারই পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি উভয়ের যথার্থ মিলন চেয়েছেন। ১৯৩১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম বঙ্গীয় মহিলা সম্মেলনে 'Educational Ideals for the Modern Indian Girls' শীর্ষক প্রবন্ধে রোকেয়া বলেন,

> 'ভারতবর্ষের নারীদের হাতেই জাতির ভবিষ্যৎ। শিক্ষাব্যবস্থাকে যথার্থ আদর্শে গড়ে তোলা তাই সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিখতে হবে তাই বলে পাশ্চাত্যের শিক্ষাপদ্ধতি হুবহু ভারতের উপর চাপিয়ে দিলে তাও হবে ভুল। ভারতবর্ষের জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে যা কিছু ইতিবাচক উপাদান, তাকে রক্ষা করতে হবে। চিন্তা ও অনুভূতির সামাজিক উত্তরাধিকার ভারতকে ধরে রাখতে হবে, একইসাথে পাশ্চাত্য থেকে প্রয়োজনীয় সবকিছু আত্মস্থ করতে হবে। আমাদের চাই শিক্ষাব্যবস্থার নতুনতর রীতিনীতি ও চর্চা যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে।'

সে সময়ে বাংলার মুসলিমদের বিশেষ করে মুসলিম নারীদের পশ্চাদপদতা যে কী মাত্রায় ছিল তা কিছুটা বোঝা যাবে রোকেয়ার সহকর্মী ফাতেমা বেগমের ১৯২৭ সালে সাহিত্যিক আবুল ফজলকে লেখা চিঠি থেকে—

৪২. রোকেয়া রচনাসংগ্রহ-ডঃ মীরাতুন নাহার, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা (৯ ডিসেম্বর ২০০১) পৃ. ৪৩৪
৪৩. রোকেয়া রচনাবলী, পদ্মরাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২৭০

'অলস অকর্মণ্য মুসলমান সমাজের নারী জাতির জন্য এই প্রবীণা বিধবা মহিলাটি যা করছেন সমস্ত ভারতে তার তুলনা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী মুসলমানদের নিদ্রা তিনি কিছুতেই ভাঙ্গাতে পারছেন না। তাঁর স্কুলে...১১৪টি মেয়ের মধ্যে মাত্র দুইটি বাঙালী। এখন বুঝতে পার বাংলার কি অবস্থা!'[৪৪]

তৎকালীন মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত মুসলিম সমাজের উর্দু প্রীতি দেখে রোকেয়া দুঃখ করে বলেছিলেন—

'ষোল বৎসর যাবৎ ...স্কুল পরিচালনার ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, এখানকার মুসলমানেরা মাতৃহীন—অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাষা নাই। তাহারা উর্দ্দুকে মাতৃভাষা বলিয়া দাবী করে বটে, কিন্তু এমন বিকৃত উর্দ্দু বলে যে, তাহা শুনিলে শ্রবণবিবর ক্ষত-বিক্ষত হয়! পর্দানশীল মুসলমান মেয়েরা বিনা বেতনেও বাংলা শিখিতে চায় না। আমি সাত বছর যাবৎ এই শহরে বাস করছি। এই সময়ে কিছু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকেই আমি বাংলায় কথাবার্তা বলতে শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না। যদিও তাদের মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ও ভুল উর্দ্দু শুনেছি। আমি তাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলা শুরু করেছি কিন্তু তারা উর্দ্দুতে জবাব দিতেই আগ্রহী। বাংলার অধিবাসী হয়েও বলেন যে, তারা বাংলা ভুলে গেছেন। তাঁরা কেবল খারাপ উর্দ্দু বলতে পারেন তবু তাঁরা উর্দ্দুতেই বলবেন।'[৪৫]

বাংলা, বিশেষকরে কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। আর বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকদের হাত দিয়ে বাংলাভাষা এবং বাংলাসাহিত্য একটা আধুনিক রূপ লাভ করেছিল। বাংলাভাষাকে ঘিরেই আধুনিক গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে উঠছিল যার ভিত্তি ছিল দেশপ্রেম-দেশাত্মবোধ। মূলত, এই দেশপ্রেম-দেশাত্মবোধ থেকেই বাংলাভাষার প্রতি রোকেয়া আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া অপরাপর ভাষা জানা ও চর্চার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও নিজের মাতৃভাষায় সমৃদ্ধ হওয়া ছাড়া যে একটা জাতি-জনগোষ্ঠী উন্নতি করতে পারে না–সে বোধও তাঁর ছিল। যে কারণে রোকেয়া শিক্ষাকোর্সে বাংলাভাষা চালু করা, বাংলায় পড়ালেখা এবং বাংলাচর্চার বিস্তারে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। বাল্যকালে তাঁর গৃহপরিবেশে বাংলা বলার চল ততটা ছিল না, বিহারে স্বামী সংসারেও বাংলাভাষার ব্যবহার ছিল না, কলকাতায় এসেও বাংলাচর্চার তেমন পরিবেশ পাননি। তা সত্ত্বেও অশেষ যত্নে ও সাধনায় তিনি বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে তার মূল্যবান চিন্তার প্রকাশ

৪৪. বেগম রোকেয়া-আব্দুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ১৯৮৩) পৃ. ১৯
৪৫. রোকেয়া রচনাসংগ্রহ-ডঃ মীরাতুন নাহার, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা (৯ ডিসেম্বর ২০০১) পৃ. ৪১৩

ঘটিয়ে গেছেন। বাংলাভাষী মানুষেরা বিশেষ করে ভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা বাঙালিজাতি সেদিক থেকেও তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই হিন্দুসম্প্রদায় চাকরিক্ষেত্রে এক বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে থাকে এবং শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বুর্জোয়া আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে থাকে। শিক্ষিত এই সম্প্রদায় হিন্দু পরিচয়ে থাকলেও হিন্দুত্ববাদী গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও জীবনাচরণকে মেনে নিতে পারছিল না। আবার রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন আধুনিকতার দিক থেকে তাদের আকর্ষণ করলেও বৃহত্তর হিন্দুসমাজের নাড়ির টান ছিন্ন করার জমিনও পাচ্ছিল না। তবে এদের মধ্যে আধুনিক জীবনবোধ থেকে একটা সংঘ চাহিদা তৈরি হয়। ১৮১৫ সালে রাজা রামমোহনের 'আত্মীয় সভা', ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী সভা', ১৮৫৩ সালে ড. মুযাটের উদ্যোগে 'বিদ্বোৎসাহিনী সভা', ১৮৫৪ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে 'সুহৃদ সমিতি' ইত্যাদি সংগঠনের বিস্তার উচ্চবিত্ত শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে নওয়াব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলীর উদ্যোগে ও অনেক ধনাঢ্য নবশিক্ষিত মুসলিম ব্যক্তির সহযোগিতায় কলকাতায় 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' গড়ে উঠেছিল। নওয়াব আব্দুল লতিফের এ উদ্যোগের পেছনে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড এলগিনের উৎসাহ ছিল। ইংরেজ শাসকদের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যের প্রশ্নে বিচারপতি সৈয়দ আমির আলী প্রমুখদের সাথে বিরোধ তৈরি হওয়ায় তাঁরা ১৮৭৭ সালে গঠন করেন 'ন্যাশনাল মহমেডান এসোসিয়েশন।' পরে তার নাম হয় 'সেন্ট্রাল মহমেডান এসোসিয়েশন'। সৈয়দ আমির আলী এবং তাঁর সহযোগীরা ইংরেজদের সাথে বড় ধরনের দূরত্ব তৈরি করতে না চাইলেও দ্বিধাহীন আনুগত্যের এবং তাদের অনুসৃত নীতি হুবহু মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন না। এইভাবে এক পর্যায়ে ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে জাতীয় কংগ্রেস। শুরুতে ক্রমাগত বেড়ে ওঠা কৃষক গণবিদ্রোহের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির স্বার্থে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা কংগ্রেসের পেছনে থাকলেও অল্প সময়ের মধ্যেই নব উত্থিত ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি করে এবং তারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যতটুকু বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে তাতেই ভারতীয় জনগণ এই সংগঠনকেই তাদের নিজস্ব সংগঠন হিসেবে এবং সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে।

সংগঠক রোকেয়া

নারীসংগঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৮৮২ সালে ঢাকায় 'সুহৃদ সম্মিলনী' নামে একটি সমিতি গড়ে উঠেছিল, যারা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার উদার মতবাদ প্রচার করেছিলেন। এ সমিতি বেশিদিন টেকেনি। ১৮৮৭ সালে ঠাকুর পরিবারের স্বর্ণ কুমারী দেবীর উদ্যোগে কতিপয় হিন্দু মহিলাদের সহায়তায় 'সখি সমিতি' গঠিত হয়েছিল।

বহুমুখী পশ্চাদদশা কাটিয়ে মুসলিম নারীসমাজে জাগরণের উদ্দেশ্যে ১৯১৬ সালে বেগম রোকেয়া স্থাপন করেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' (মুসলিম নারীসমিতি)। অতীতের নারীসংগঠনগুলোর সাথে এ সংগঠন গঠনের উদ্দেশ্য-আদর্শের ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল অনেক। ১৯১৭ সালের এক বার্ষিক সভায় এ সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল—

> 'এই সমিতি গতবছরের শুরুতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ: কলকাতানিবাসী মুসলমান মহিলাদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ, ঐক্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; মুসলিম নারীদের সামাজিক অবস্থানের উন্নয়নকল্পে সামাজিক কুপ্রথা দূর করা এবং যথার্থ কার্যকর জ্ঞানের বিস্তার; গরীব-দুস্থ মুসলিম নারীদের নিজ জীবিকা অর্জনে সক্ষম করে তুলতে তাদের হস্ত শিল্প প্রশিক্ষণের জন্য কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা।'[৪৬]

ওই বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশের মধ্যেই রোকেয়া সামাজিক সংস্কারভাবনা, নারীশিক্ষা ও শিক্ষা আন্দোলন, সংগঠন ও সাংগঠনিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯২২ সালে ডা. লুৎফর রহমান প্রতিষ্ঠিত 'নারী তীর্থ' নামক সংগঠনের সভানেত্রী হিসেবেও তিনি পতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনকল্পে অনেক কষ্টসাধ্য কাজ করেছেন। ঘরের চার দেয়ালের বাইরে টেনে এনে মহিলাদের সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করানোর কাজটি যে তৎকালীন সময়ে কতটা দুঃসাধ্য এবং ঝুঁকিপূর্ণ ছিল তা আজ ভাবাও দুঃসাধ্য। কিন্তু রোকেয়া একাজে হতোদ্যম হননি। এজন্য তিনি ভীষণভাবে নিন্দিত হয়েছিলেন কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেননি। নারীদের মধ্য থেকে অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূরীকরণ, নির্যাতন ও

---

৪৬. 'The society was founded in the beginning of last year, with the object of promoting unity, social intercourse and friendly feeling among Mohamedan ladies resident in Calcutta by providing them with a common meeting ground, to better the condition of Moslem women in general by eradicating pernicious social custom and by diffusing proper and useful knowledge and to establish and conduct an industrial school for teaching useful handicrafts to poor and needy Mohamedan women with a view to qualify them to earn their own livelihood.' ('দি মুসলমান' পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ-লায়লা জামান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৬২)

অন্যায় প্রতিরোধ, সমাজ সংক্রান্ত সমস্যা, বিবাহ-তালাক সম্পর্কে সচেতনতা, দুঃস্থদের সহায়তা, মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানদানসহ স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রচেষ্টাও ছিল লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে শামসুন নাহার বলেন—

> 'প্রারম্ভে এই সমিতি (আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম) গঠনের উদ্দেশ্যে রোকেয়া যখন লোকের দুয়ারে ফিরিতেন, তখন তাঁহাকে সমাজের চোখে কতই না হেয় ও হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছিল। মুসলমান মেয়েরা ঘরের কোন ছাড়িয়া সভা-সমিতিতে যোগদান করিবেন, একথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। দিনের পর দিন চেষ্টা করিয়া ঘরে ঘরে গিয়া তিনি তাহাদের মুখের ঘোমটা খসাইলেন, হাত ধরিয়া ধরিয়া এক একজনকে ঘরের বাহির করিলেন। কোথায়ও হয়তো বন্দিনী নারী রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু তখনই মনে পড়িয়াছে অভিভাবকের রোষকষায়িতলোচন। রোকেয়ার পরামর্শ অনুসারে তখন তিনি সভার নির্দিষ্ট তারিখে কোনো নিকট-আত্মীয়ের গৃহে যাইতেছেন বলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে ঝুলিতে রহিয়াছে সভায় যোগদান করিবার উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদ। এভাবে হতভাগিনীদের শৃঙ্খল কাটবার চেষ্টায় রোকেয়া বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। ...একবার রোকেয়া নিজেই বলিয়াছিলেন, অনেক সাধ্যসাধনার ফলে নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া একটি শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের এক মহিলাকে আঞ্জুমানের মিটিংয়ে আনা গেল। যথাসময়ে মিটিংয়ের কাজ শেষ হইল। সমবেত মহিলারা গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময় নবাগতা মহিলাটি রোকেয়ার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—'সভার নাম করিয়া বাড়ীর বাহির করিলেন, কিন্তু সভা তো দেখিতে পাইলাম না!' রোকেয়া অনেক কষ্টে বুঝাইতে পারিয়াছিলেন যে, এখনই যে-কাজ শেষ হইয়া গেল তাহারই নাম সভা।'[৪৭]

সমিতি সম্পর্কে আনোয়ারা বাহার চৌধুরী বলেন—

> 'সমিতির পক্ষ থেকে কলকাতার বস্তি অঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ হতো। সেখানে শিক্ষাকেন্দ্র খুলে মেয়েদের প্রাথমিক লেখাপড়া, সেলাই ও হাতের কাজ শেখানো হতো, সেই সঙ্গে ধর্ম শিক্ষা, শিশুপালন ও স্বাস্থ্যবিধিও শিক্ষা দেওয়া হতো।'

শামসুন নাহার মাহমুদ সমিতির কার্যাবলি সম্পর্কে আরও বলেন—

> 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম দীর্ঘকালের জীবনে কি কি কাজ করিয়াছে তাহার বিবরণ আলোচনা করিলে দেখা যায়; অতীতে বহু বিধবা নারী

৪৭. রোকেয়া জীবনী-শামসুন নাহার মাহমুদ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা (মার্চ ১৯৯৬) পৃ. ৫০-৫১

ইহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে। বহু বয়োঃপ্রাপ্তা দরিদ্রা কুমারী ইহার সাহায্যে সৎপাত্রস্থা হইয়াছে, বহু অভাবগ্রস্থা বালিকা ইহার অর্থে শিক্ষালাভ করিয়াছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজসেবা ও পরোপকারের কথা উল্লেখ করিলে ইহার সম্পর্কে কিছুই বলা হইল না। কলিকাতার মুসলমান নারী সমাজের গত বিশ বৎসরের ক্রমন্নোতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় এই সমিতি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে মুসলমান সমাজকে কতখানি ঋণী করিয়া রখিয়াছে।'[৪৮]

রোকেয়ার ইতিহাস চেতনা

সভ্যতা বলতে পুরুষ কিংবা নারী সভ্যতা বোঝায় না, সভ্যতা মানেই মানবসভ্যতা। কিন্তু সমাজ শ্রেণি বিভক্ত হওয়ার পর থেকে দাসব্যবস্থা, সামন্তবাদীব্যবস্থা হয়ে আজকের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার কোথাও শ্রেণিবৈষম্য ও নর-নারী বৈষম্যমুক্ত সভ্যসমাজ দেখা যায়নি। মাত্রাগত তারতম্য নিয়ে নারীর জীবনকে শৃঙ্খলিত, অধীনস্ত করে রাখার দৃশ্য-অদৃশ্য রাষ্ট্রীয় শক্তি, বিধি-বিধান, সামাজিক প্রথা, আইন-কানুন, ধর্মীয় রীতি-নীতি, সংস্কার-কুসংস্কারের সামাজিক সাংস্কৃতিক বলয়ে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য বহাল রয়েছে। দাসযুগে নারীদের বাঁচিয়ে রাখা কিংবা মেরে ফেলার মালিকি সিদ্ধান্তসহ রাখা এবং ছুঁড়ে ফেলার বর্জ্যদশা থেকে সামন্তীয়ব্যবস্থায় নারীদের গৃহসামগ্রীর জায়গায় উত্তরণ ঘটে। সে অবস্থা থেকে মুক্ত করে পুঁজিবাদ তাকে বাজারি পণ্যের ডালিতে সাজিয়েছে। নারীর এই করুণদশার কাহিনি ইতিহাসের দীর্ঘ পাতাজুড়ে রয়েছে। এর ফলে নারীর অধঃস্তন দশা সম্পর্কে যে ধারণা সমাজে চালু হয়ে গিয়েছিল তার উল্লেখ করে মনীষী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বলেন—

'অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তির সময় থেকে যে সব অসম্ভব ধ্যান-ধারণা আমাদের সময় পর্যন্ত চলে এসেছে তার মধ্যে একটা হল এই যে নারী যেন সমাজের সূচনা থেকেই পুরুষের দাস ছিল।'[৪৯]

এই অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্ত এবং নারীরা পুরুষের তুলনায় সামর্থ্যে, মেধায়-চিন্তনে, দক্ষতায় প্রাকৃতিকভাবেই হীন–এইসব অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অসারতা তুলে ধরে মার্কস-এঙ্গেলস মানবসমাজ বিকাশের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, যতদিন সমাজে শ্রেণি সৃষ্টি হয়নি, সামাজিক সম্পত্তির উপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ততদিন নারীরা পুরুষের অধীনস্ত হয়নি। বরং

৪৮. রোকেয়া জীবনী-শামসুন নাহার মাহমুদ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা (মার্চ ১৯৯৬) পৃ. ৫০
৪৯. পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি-ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

শ্রেণি, রাষ্ট্র এবং পরিবার প্রথা উদ্ভবের আগে আদিম গোষ্ঠীসমাজে নারীরাই সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এঙ্গেলসের ভাষায়—

> 'এই মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালির কর্তৃত্ব দখল করল, স্ত্রীলোক হলো পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্র মাত্র।'[৫০]

এঙ্গেলসের কথার প্রতিধ্বনি করেই যেন রোকেয়া বলেন—

> 'আদিমকালের ইতিহাস কেহ জানে না বটে; তবু মনে হয় যে, পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোনো অজ্ঞাত কারণবশতঃ মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানা বিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।'[৫১]

অজৈব তথা জড় পদার্থ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় জৈবজীবন উদ্ভবের কাল থেকে জীবন সৃষ্টি, জীবন রক্ষা এবং পরম্পরায় বংশবিস্তার লাভের প্রয়োজনে নারী এবং পুরুষে শারীরিক গঠনগত পার্থক্য প্রকৃতিরই সৃষ্টি। পার্থক্য এবং বৈষম্য এক জিনিস নয়। একটি প্রাকৃতিক, অন্যটি সামাজিক। শ্রেণি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, সম্পদ দখল ও উত্তরাধিকারের প্রয়োজনকে সামনে রেখে নর-নারীর মাঝে যে বৈষম্য রেখা চিহ্নিত হয়েছিল তা ধীরে ধীরে সমাজে গভীর ক্ষতরেখা অঙ্কিত করে সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে সমাজ-সভ্যতার বিকাশকে বারে বারে হুমকির মুখে দাঁড় করিয়েছে। নারী সন্তান গর্ভে ধারণ করে এবং লালন করে মানব অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে, অথচ প্রাচীনকালে গর্ভধারণকালীন সময়ে বস্তুত উৎপাদন প্রতিযোগিতায় পিছনে পড়ে যাওয়ার সুযোগ এবং আদিম সাম্যের নারীতান্ত্রিক সমাজ ভেঙে শ্রেণিভিত্তিক শোষণের সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে পুরুষতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে, নারী শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। নারীরা সহজেই তা মেনে নেয়নি, অনেক সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ইতিহাসে রয়েছে। কিন্তু কালক্রমে পিঞ্জরাবদ্ধ শক্তিহীন দশায় পতিত হয়ে অধীনতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। রোকেয়া বলেন—

> 'পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোনো দিন আপনাদের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে আমরা কি? দাসী! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের

---

৫০. পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি-ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা (সেপ্টেম্বর ২০০৮) পৃ. ৪১

৫১. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর:প্রথম খণ্ড, স্ত্রীজাতির অবনতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ১১-১২

দাসত্ব গিয়াছে কি? না। ...স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকল প্রকার কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে পুরুষ পক্ষ হইতে যতই বেশী সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রী-পক্ষ ততই অধিকতর অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল। ...ক্রমশঃ আমাদের মন পর্য্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে। এবং আমরা বহুকাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে আমাদের স্বাবলম্বন, সাহস প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলন অভাবে বারবার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর বোধ হয় অঙ্কুরিতও হয় না। কাজেই পুরুষজাতি বলিতে সুবিধা পাইয়াছেন : 'The five worst maladies that afflict the female mind are: indocility, discontent, slander, jealousy and silliness ... such is the stupidity of her character, that it is incumbent on her, in every particular, to distrust herself and to obey her husband.' (Japan, the land of the rising sun) (অর্থাৎ স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণের পাঁচটি দুরারোগ্য ব্যাধি এই—[কোন বিষয় শিক্ষার] অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মূর্খতা। ...নির্বোধ স্ত্রীলোকের কর্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া স্বামীর আদেশ পালন করে)। ...এদেশে জামাতা খুব আদরণীয়—এমনকি ডাইনীও জামাই ভালবাসে। তবু 'ঘর জামাইয়ের' সেরূপ আদর হয় না। তাই দেখা যায়, আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও থাকিল না, তখন কাজেই তাঁহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে ক্রমে আমাদের 'স্বামী' হইয়া উঠিলেন। আর আমরা ক্রমশ তাহাদের গৃহপালিত পশু পক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি। ...কিন্তু জিজ্ঞাসা করি 'স্বামী' শব্দের অর্থ কি? দানকর্ত্তাকে 'দাতা' বলিলে যেমন গ্রহণ কর্ত্তাকে 'গ্রহীতা' বলতেই হয়, সেইরূপ একজনকে 'স্বামী, প্রভু, ঈশ্বর' বলিলে অপরকে 'দাসী' না বলিয়া আর কি বলিতে পারেন?'[৫২]

শ্রেণিসমাজ পত্তনকালে নর-নারীর সংঘাত-সংঘর্ষের এক পর্যায়ে জবরদস্তিতে পরাস্ত করা নারীদের হাতে পায়ে বেড়ি, গলায়-কোমরে শিকল ইত্যাদি বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ এই কঠিন ভয়ংকর বস্তুগুলি রূপান্তরিত হয়ে নারীর সৌন্দর্য বর্ধনের আদরের সামগ্রী হয়ে ওঠার কথা উল্লেখ করে রোকেয়া বলেন—

'আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি—এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ। এখন ইহা সৌন্দর্য্য-বর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (Originally badges of

৫২. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর:প্রথম খণ্ড, স্ত্রীজাতির অবনতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ১১-১২

slavery) ছিল। তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ পায় লৌহনির্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণ-রৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ 'মল' পরি। উহাদের হাতকড়ী লৌহ-নির্মিত, আমাদের হাতকড়ী স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত চুড়ি! বলা বাহুল্য লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয়না! কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (dogcollar) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে! অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণ-শৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি 'হার পরিয়াছি।' গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া নাকাদড়ী পরায়, ...যাহার শরীরে দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্যাগণ্যা ! এই অলঙ্কারের জন্য ললনাকূলের কত আগ্রহ। যেন জীবনের সুখ সমৃদ্ধি উহারই উপর নির্ভর করে। তাই দরিদ্রা কামিনীগণ স্বর্ণ রৌপ্যের হাতকড়ী না পাইয়া কাচের চুড়ি পরিয়া দাসী-জীবন স্বার্থক করে। ...যদি অলংকারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্য্য-বর্ধনের উপায় মনে করা হয়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্য্যবর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্বলতা নহে? পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন। তাহারা কোনো বিষয়ে তর্ক করিতে গেলে বলেন, 'আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব।'[৫৩]

নারীরা আদিকালে শারীরিক সক্ষমতায় এবং কর্মদক্ষতায় পুরুষের চেয়ে পেছনে ছিল না তার অনেক নজির প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণে রয়েছে। প্রকৃতিতে এবং সমাজে বিদ্যমান পরিবেশ-পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে, জয় করে এবং যে সংগ্রাম করে ছোটখাটো পরিবর্তন থেকে শুরু করে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষকে বাঁচতে হয়, সেখান থেকে নারীকে ক্ষেত্রবিশেষে পিছিয়ে রাখা হলে তার সক্ষমতা অনেক কমে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। একই ঘটনা পুরুষের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারতো যদি তাদেরকেও একইভাবে বহু বিচিত্র কর্মক্ষেত্রের বিশাল সীমানার মাঝে ক্ষুদ্র সীমারেখা টেনে আটকে রাখা হতো কিংবা নির্ধারিত সীমানার বাইরে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করা হতো।

রোকেয়া মিস মেরী করেলী রচিত Murder of Delicia উপন্যাসের অংশবিশেষ অনুবাদ করে ডেলিশিয়ার ন্যায় ভারতবর্ষের নিপীড়িত নারীচরিত্র হিসেবে 'মজলুমা'র উল্লেখ করে দেখিয়েছেন নারীজাতি পৃথিবীর সর্বত্রই নিপীড়িত। তিনি লিখেন—

'ইংরেজ রমনীর জীবন কিরূপ? আমরা মনে করি, তাহারা স্বাধীন, বিদুষী, পুরুষের সমকক্ষা, সমাজে আদৃতা, তাঁহাদের আরও কত কি সুখ সৌভাগ্যের চাকচিক্যময় মূর্তি মানস নয়নে দেখি। কিন্তু একবার তাহাদের

৫৩. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর:প্রথম খণ্ড, স্ত্রীজাতির অবনতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ১৩, ১৪, ১৫

> গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলে বুঝি সব ফাঁকা! দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতিমধুর! সভ্যতা ও স্বাধীনতার লালনভূমি লন্ডন নগরীতে শত শত 'ডেলিশিয়া বধ কাব্য' নিত্য অভিনীত হয়। হায়! রমনী পৃথিবীর সর্বত্রই অবলা'!

অধঃস্তন দশার চিত্র এক হলেও ইংল্যান্ডের ডেলিশিয়া আর পরাধীন ভারতবর্ষের মজলুমার মধ্যে যে পার্থক্যটুকু রয়েছে তা দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন,

> 'ডেলিশিয়া স্বাধীনা, রাজার জাতি এবং অন্তঃপুর বন্দিনী নহেন, আর মজলুমা পরাধীনা, প্রজার জাতি এবং কঠোর অবরোধে বন্দিনী, কিন্তু উভয়ের অবস্থাগত পার্থক্য কতটুকু? অধিক নয়—উভয়ে অবলা! উভয়ই সমাজের অত্যাচারে মর্মপীড়িতা! কিন্তু ডেলিশিয়া বিদূষী এবং মজলুমা নিরক্ষর—এই একটা ভারী পার্থক্য আছে। ...ইহার কারণ এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার অভাব। মজলুমা ভূমিষ্ঠ হইয়াই শুনিতে পায়, 'তুই জন্মেছিস গোলাম; চিরকাল থাকবি গোলাম।' সুতরাং তাহার আত্মা পর্যন্ত গোলাম হইয়া গিয়াছে। সে আর নিজের মূল্য জানে না—পুরুষ আত্মীয়দের কর্তৃক বারম্বার পদদলিত হইলেও সে তাহাদের পদ লেহনে বিরত হয় না। স্বাধীনা-ডেলিশিয়ায় ও পরাধীনা-মজলুমায় এই প্রভেদ।'

এ উপন্যাসে রোকেয়ার সংগ্রামী মনোভাব ফুটে উঠেছে—

> 'সমাজ সংস্কার করিতে হইলে কতিপয় মজলুমাকে ডেলিশিয়ার ন্যায় 'সমরশায়িনী' হইতে হইবে। তা সাধুদের আত্মোৎসর্গ বিনে এই জগতে কোন ভাল কাজটি হইয়াছে?'

সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার পর থেকে কখনও শাসক এবং শাসিত, শোষক এবং শোষিত শ্রেণিভুক্ত মানুষ সমান অধিকার, সুযোগ, মর্যাদা, আর্থিক সক্ষমতা কোনোটাই লাভ করেনি। এ বিষয়ে রোকেয়া সচেতন ছিলেন। আমরা সাধারণত ইতিহাস আলোচনায় অনেককেই বলতে শুনি অতীতে এমন স্বর্ণযুগ নাকি আবির্ভূত হয়েছিল যেখানে অভাব, দারিদ্র, বৈষম্য, উৎপীড়ন সব উধাও হয়ে গিয়েছিল। কোনো একজন শাসক রাজা, জমিদার, সেনাপতি, উদারপতি যেই হোক তার শাসনামলে গোলা ভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, অন্নপূর্ণার হাড়ি পেয়ে মানুষ আহারে, বিহারে, আনন্দে, উৎসবে মেতে ছিল। এগুলোর ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। শোষণের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বহাল রেখে শাসকদের চেহারার যত পরিবর্তনই ঘটুক তাতে অসাম্য-বৈষম্যের অবলুপ্তি হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের শাসকদের আপেক্ষিক উদারতা, দক্ষতা, পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদির কারণে মাত্রাগত কিছুটা তারতম্য ঘটতে পারে, মৌলিক পরিবর্তন আসতে পারে না। তার জন্য শোষণমূলক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন

দরকার। যেমন, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ওইসব উপসর্গের মূলোৎপাটন মানুষ দেখতে পেয়েছিল। আবার ১৯৯০ সালে প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে সেখানে শোষণের ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্বাভাবিক নিয়মে পুরোনো পুঁজিবাদী উপসর্গগুলোও ফিরে এসেছে। রোকেয়া 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'এ কঠোর মহীতে
চাষা এসেছে শুধু সহিতে
আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে
জঠর-অনলে দহিতে...

আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা,—তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন, 'ধান্য তার বসুন্ধরা যার'। তাই ত অভাগা চাষা কে? সে কেবল 'ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে,' হাল বহন করিবে, আর পাট উৎপাদন করিবে।'

কেউ কেউ কৃষকদের দুর্দশার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে দায়ী করে বলেন—'ইউরোপের মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, তা বঙ্গীয় কৃষকের কথা কি?' রোকেয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় জনজীবনে নেমে আসা দুর্ভোগকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু ধনী-গরিবে বিভক্ত বৈষম্যের সমাজে পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত খেটে খাওয়া মানুষের জীবন প্রাচুর্য উদগীরণ করে অথচ নিজে দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে থাকে। রোকেয়া এ সত্যকে উদ্ঘাটিত করে বলেন—

'ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ ত এই সাত বছরের ঘটনা। ৫০ বছর পূর্ব্বেও কি চাষার অবস্থা ভাল ছিল? ...বাল্যকালে শুনিতাম টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, আর টাকায় ৪ সের ঘৃত। যখন টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, তখনকার একটা গল্প এই: 'কৃষক কন্যা জমিরনের মাথায় বেশ ঘন ও লম্বা চুল ছিল, তার মাথায় প্রায় আধ পোয়াটাক তেল লাগিত। সেই জন্য যেদিন জমিরন মাথা ঘষিত, সেদিন তাহার মা তাকে রাজবাড়ী লইয়া আসিত, আমরা তাকে তেল দিতাম।' হা অদৃষ্ট! যখন দুই গণ্ডা পয়সায় এক সের তৈল পাওয়া যাইত, তখনও জমিরনের মাতা কন্যার জন্য এক পয়সার তৈল জুটাইতে পারিত না। এই ত ৩০/৩৫ বৎসর পূর্ব্বে বেহার অঞ্চলে দুই সের খেসারী বিনিময়ে কৃষক-পত্নী কন্যা বিক্রয় করিত!'

সমাজে শ্রেণিশোষণের এই মর্মান্তিক চিত্র শ্রেণিবিভক্তির পর থেকে আজও বহাল রয়েছে। বরং অতীতের তুলনায় বিত্তবানদের ক্ষমতা ও সম্পদের পরিমাণ ও ভোগবিলাসী জৌলুষ একদিকে বাড়ছে, অন্যদিকে শ্রমজীবী মেহনতী দরিদ্র

জনগোষ্ঠী তাদের জীবনের উপর জীবন বিনাশী বোঝা বহন করে পিলসূজের মতো সভ্যতার আলো জ্বেলে বেদনার নীল সাগরে হারিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসের শ্রেণিচেতনাগত এই উপলব্ধিও রোকেয়া সঠিকভাবেই ধারণ করতেন—

> 'যে সমাজ রাজা ও প্রজা সৃষ্টি করিয়াছে, পুলিশ প্রভু ও বড়লাট প্রভুর মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সমাজ নারীকে নরের অধীন করিয়াছে।'[৫৪]

রোকেয়ার দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক সচেতনতা

বেগম রোকেয়া পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন। তার মূল সাহিত্যকর্ম যে সময়টাতে রচিত হয়েছিল তা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের উত্তাল সময়। বেগম রোকেয়া সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং পরাধীনতার গ্লানিও তিনি মর্মে অনুভব করতেন। তিনি মনে করতেন মর্মে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করা না গেলে, শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীন চিত্তের অনুভব শক্তি গড়ে তুলতে না পারলে, সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখে আর যাই হোক্ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না। যেজন্য তিনি বলছেন—

> '...যাহারা নিজের সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না, তাহারা আর দেশোদ্ধার কি রূপে করিবে? অর্ধাঙ্গীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা পাগলেরই শোভা পায়।'[৫৫]

> ...'আমরা সমাজেরই অর্দ্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোনো ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই।'[৫৬]

বুর্জোয়াশ্রেণি ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে তাদের উত্থানের কালে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের কল্পনা করেছিলেন (যা কোথায়ও বাস্তবায়িত হয়নি) তা শুধু নরের জাগরণের ভিত্তিতে ভাবা হয়নি। নর-নারী নির্বিশেষে সকল জনগণই তো ক্ষমতার উৎস। জনগণের স্বার্থে, কল্যাণে এবং তাদের দ্বারা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতেই তো গণতান্ত্রিক শাসনকার্য পরিচালিত হবে। তাহলে of the rich, by the rich & for the rich নীতিতে যেমন গণতন্ত্র হয় না তেমনি of the male, for the male এবং by the male দিয়েও তা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের

---

৫৪. রোকেয়া রচনাসংগ্রহ (অলঙ্কার না Badge of Slavery)-ড. মীরাতুন নাহার, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা (৯ ডিসেম্বর ২০০১) পৃ. ৬০৫

৫৫. রোকেয়া রচনাবলী, বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি (সভানেত্রীর অভিভাষণ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২২৮

৫৬. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, স্ত্রীজাতির অবনতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২২

ও স্বাধীনতার এই মূল মর্মবস্তু ও অন্তসারসত্তার দিকেই রোকেয়ার মনযোগ ছিল কেন্দ্রীভূত।

সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র '*বিবিধ প্রবন্ধে*' বলেছিলেন—

> 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।'[৫৭]

সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,

> 'সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে তার ভিতরের বাসনা কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ।'[৫৮]

তিনি আরও বলেছিলেন—

> '...সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা।'[৫৯]

আর নজরুল চেয়েছিলেন, তাঁর লেখনির সাহায্যে যাতে 'তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস' যারা কেড়ে খায় 'তাদের সর্বনাশ' সাধিত হয়।

রোকেয়া নিঃসহায় একাকী অবস্থান থেকে দেশের ও মানুষের কল্যাণেই কলম ধরেছিলেন। যেজন্য তিনি বলেছেন—

> 'না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগিবে না...'[৬০]

তিনি ভারতবাসীর পরাধীনতার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

> 'পুরুষদিগকেও বলি—ভাতৃগণ! আমরা স্বাধীন না হইলে তোমরাও স্বাধীন হইবে না। নিশ্চয় জানিও, আমরা যতদিন পরাধীন থাকিব, তোমরাও ততদিন পরাধীন থাকিবে। তোমরা আমাদের উপর প্রভুত্ব কর বলিয়া তোমাদের উপর আর এক জাতি আধিপত্য করিতেছে।'[৬১]

> 'শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ

---

৫৭. বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বিবিধ প্রবন্ধ; বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড)

৫৮. ভবিষ্যৎ বঙ্গ সাহিত্য-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎরচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা (নভেম্বর ২০১৬) পৃ. ৯৬৯

৫৯. সাহিত্যের রীতি ও নীতি-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎরচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা (নভেম্বর ২০১৬) পৃ. ৯৯১

৬০. রোকেয়া রচনাবলী, সিসেম ফাঁক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২১৩

৬১. রোকেয়া রচনাসংগ্রহ-ডঃ মীরাতুন নাহার, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা (৯ ডিসেম্বর ২০০১) পৃ. ৬১৩

> রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইহাতে তাহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। তাই তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে ও উঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন।'[৬২]

রোকেয়া শুধু লেখা ও নারী শিক্ষা প্রসারের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি মহিলাদের সংগঠিত করার জন্য নিখিলবঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯২০ সাল থেকে 'বঙ্গীয় নারী সমাজ' নামে নারীদের ভোটাধিকারের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে ব্রাহ্মসমাজের নারীরাই ছিল সংখ্যায় অধিক। বেগম রোকেয়া সেই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৩ সালে স্থানীয়ভাবে নারীদের ভোটাধিকারের দাবি গৃহীত হয়েছিল। ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতির সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তিনি মুসলিম মহিলাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অনীহার সমালোচনা করে বলেন—

> 'এখন স্ত্রীলোকেরা ভোটদানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহারে স্বেচ্ছায় বঞ্চিতা রহিয়াছেন। গত ইলেক্‌শনের সময় দেখা গেল কলিকাতায় মাত্র ৪ জন স্ত্রীলোক ভোট দিয়েছে। ইহা কি মুসলমানদের জন্য গৌরবের বিষয়?'[৬৩]

রোকেয়া মুসলিম সম্প্রদায় বিশেষভাবে মুসলিম নারীদের জাগরণের যে চেষ্টা করেছিলেন তা পরাধীন ভারতে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধারণ করে তার অংশ হিসেবেই নিয়েছিলেন। ব্রিটিশের ভারত দখলের পূর্ব পর্যন্ত সর্বভারতীয় কেন্দ্রীভূত জাতীয় অর্থনীতি এবং জাতীয় বাজারকে ঘিরে জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে ওঠেনি। ইংরেজ শাসনের আওতায় ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মাচরণগত বহু পার্থক্য সত্ত্বেও সর্বভারতীয় জাতীয় সংহতি, অর্থনৈতিক কেন্দ্র ও জাতীয় বাজার গড়ে ওঠার পাশাপাশি ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের পথে এক জাতি তথা ভারতীয় জাতি মনোভাব বিকশিত হয়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলন আপসহীন এবং আপসকামী দুটো ধারায় বিভক্ত ছিল। বুর্জোয়াদের দুর্বলতার কারণে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসকামী ধারাই প্রধান ধারা হিসেবে সামনে চলে আসে। সুভাষ-ভগৎ সিং-শরৎচন্দ্র-নজরুলের সেক্যুলার আপসহীন স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা প্রধান ধারা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেনি। গান্ধী-নেহেরুদের আপসকামী ধারাটি শুরু থেকেই হিন্দু ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের ওপর ভর করে এগিয়েছে। এক পর্যায়ে ব্রিটিশদের 'ভাগ কর এবং শাসন কর' নীতির প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের

---

৬২. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, বোরকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৪৫
৬৩. রোকেয়া রচনাবলী, বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি (সভানেত্রীর অভিভাষণ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২২৮

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক ভাবমানসজাত স্বাধীনতা ধারার আবির্ভাব ঘটে। রোকেয়া আপসকামী ধারাকে যেমন সমর্থন করতে পারেননি, তেমনি খণ্ডিত জাতীয়তাবাদীদের পক্ষেও তিনি ছিলেন না। তাঁর মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা ও শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণি-ঐক্যের চেতনার এক অপূর্ব সমন্বয় আমরা দেখতে পাই। সুগৃহিণী সম্পর্কে নীতিকথা এবং তাদের কর্তব্য-কর্মের নানা বিষয় নিয়ে ঠাকুরবাড়ির জ্ঞানদানন্দিনী দেবীসহ অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু রোকেয়া 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধে এমন এক কর্তব্য-দায়িত্বের বিষয় নিয়ে আসলেন যা অন্যদের চিন্তায়, লেখায় এত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। তিনি লিখলেন—

> 'আদর্শ গৃহিণীর প্রতিবেশিনীর বিপদকে নিজের বিপদ বলিয়া মনে করা উচিত। আর প্রতিবেশীর পরিধি বৃহৎ হওয়া চাই—অর্থাৎ প্রতিবেশী বলিলে যেন কেবল আমাদের দ্বারস্থিত গৃহস্থ না বুঝায়। বঙ্গদেশের প্রতিবেশী বলিতে পাঞ্জাব, অযোধ্যা, উড়িষ্যা-এ সবই যেন বুঝায়। হইতে পারে পাঞ্জাবের একদল ভদ্রলোক কোনো কারখানায় কাজ করেন; সেই কারখানায় কর্তৃপক্ষকে তাহারা বিশেষ অভাবের বিষয় জানাইতে বারম্বার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হওয়ায় ধর্মঘট করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ ধর্মঘটকেই যেন উড়িষ্যা বা মাদ্রাজের লোকে নিজেদের কার্যপ্রাপ্তির সুযোগ ভাবিয়া আহ্লাদিত না হন। সুগৃহিণী আপন পতি পুত্রকে তাদৃশ ধর্মঘটস্থলে কার্যগ্রহণে বাধা দিবেন। আর স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পারসী বা খ্রিষ্টান অথবা বাঙালি, মাদ্রাজী, মারওয়াড়ী বা পাঞ্জাবী নহি—আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী—তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু। সুগৃহিণী এই সত্য আপন পরিবারের মধ্যে প্রচার করিবেন।'

এই প্রবন্ধ ১৯০৪ সালে লেখার পরই ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, বিপ্লববাদী আন্দোলন যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, রোকেয়ার সে বিষয়েও সজাগ দৃষ্টি ছিল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন মেয়েদের অংশগ্রহণ বাদ দিয়ে পূর্ণতা লাভ করবে, রোকেয়া কখনও তা মনে করতেন না। সে ভাবনারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন দুটি রূপকথাকে আশ্রয় করে—একটি 'মুক্তিফল' অন্যটি 'জ্ঞানফল'। ১৯০৫ সাল থেকে কংগ্রেসে আপসকামী ও আপসহীন ধারার বিরোধের জেরে কংগ্রেস বিভক্তির পর ১৯০৭ সালে 'মুক্তিফল' লেখাটি রচিত হয়েছিল। 'মুক্তিফল'-এ আমরা দেখি—

> 'যিনি এক কালে ভোলাপুরের রাণী ছিলেন, তিনি অদ্য কাঙ্গালিনী। কাঙ্গালিনী তরুতলে শ্যামল দুর্ব্বাশায়নে শায়িতা; অসংখ্য মশামাছি তাহার

> ক্ষত অঙ্গ বেষ্টন করিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতেছে। তিনি রোগে ভুগিয়া এত দুর্বল হইয়াছেন যে মশা মাছিও তাড়াইতে পারেন না। ...তরুশাখায় বসিয়া একটি পাখি মধুর স্বরে বলিতেছিল—'চৌদ্দপুত–এত দুঃখ!' তাহা শুনিয়া কাঙ্গালিনী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'পাখীটা আমারই দুঃখগাঁথা গাহিতেছে! আমি শত শত পুত্রের জননী হইয়া এত কষ্ট ভোগ করিতেছি! হায়! আমার এ দুঃখ অমানিশা কি কখনো পোহাইবে?'

এই কাঙ্গালিনী পরাধীন ভারতবর্ষ। মেয়েদের প্রতি অযত্ন-অবহেলার অভিশাপে তার এই দুর্দশা। কৈলাশ থেকে মুক্তিফল না পেলে এ-দশা কাটবে না। ভাইদের একক চেষ্টায় বারে বারে তা ব্যর্থ হয়। পরিশেষে ভাইদের সঙ্গে বোনেরা যোগ দেয়ায়

> 'কাঙ্গালিনীর মনে সাহস এল, 'এ কি দেখি, আমার কোমলাঙ্গী ননির পুতুল দুহিতা ক্ষুদ্র স্বার্থ—সাংসারিক ভোগবিলাস জলাঞ্জলি দিয়া আমার সেবায় নিযুক্তা হইল! শ্রীমতি ও সুমতি যখন তাহাদের ভ্রাতাদের কার্য্যে যোগদান করিতে বদ্ধপরিকর হইল, তখন আমার ভরসা হয় সম্ভবতঃ আমার সুদীর্ঘ নিরাশাযামিনী প্রভাত হইবে। ...এতদিনে হয়তো আমার সন্তান-সন্ততি মুক্তিফল আনিতে পারিবে।'

অর্থাৎ ভারতবর্ষে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হবে।

'জ্ঞানফল' রচনাটিতে জ্ঞানফলকে শিক্ষা আর পরীস্থানকে বিলাত ও কনকদ্বীপকে ভারতবর্ষ হিসেবে বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে আবার আদম-হাওয়ার কাহিনিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মানবের উদ্ভব ও পৃথিবীতে আগমনের ধর্মীয় ব্যাখ্যার বিপরীতে ভিন্ন বোধে ও মাত্রায় রসগ্রাহী আকর্ষণীয় উপস্থাপনায়। প্রাচীনকালে ইংল্যান্ডের চেয়েও ভারতবর্ষ ছিল অনেক সমৃদ্ধশালী এবং উন্নত সভ্যতার অধিকারী। কিন্তু ভারতীয়রা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা না করে পিছিয়ে পড়ে। ইংরেজরা ভারতীয়দের অবহেলায় ফেলে রাখা জ্ঞানফল আয়ত্ত্বে এনে উন্নত হয় এবং বাণিজ্যসূত্রে ভারতে এসে দেশ দখল করে নেয়। ২০০ বছর পরে আবার শুকিয়ে যাওয়া জ্ঞানবৃক্ষে ভাই ভগিনীরা মিলে জল সিঞ্চন করে বাঁচিয়ে তোলে। তারপর নিজেদের দেশ নিজেদের হলো। কনকদ্বীপের স্বাধীনতা ও জ্ঞানফল হস্তগত করতে পরীস্থানের বাসিন্দারা আর বাধা দিতে পারেনি। আদম হাওয়ার কাহিনিতে আদম হাওয়াকে স্বর্গের উদ্যানে পরম সুখে দেখানো হয়েছে। ঈশ্বর তাদেরকে একটি ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। একদিন হাওয়া অন্যমনস্ক হয়ে ফলটি খেতেই তার জ্ঞানচক্ষু উন্মেলিত হয়ে গেল। পত্নীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানফল ভক্ষণ করে আদমেরও জ্ঞানোদয় ঘটল। তাদের মনে স্বাধীন হওয়ার চেতনা জাগলো। স্বর্গবাস তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলো। তাদের মনে প্রশ্ন জাগলো, 'এই

কি স্বর্গ? প্রেমহীন, কর্ম্মহীন অলসজীবন—ইহাই স্বর্গসুখ?' জগদীশ্বর তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। হাওয়ার ভুক্তাবশিষ্ট যে নিষিদ্ধ জ্ঞানফলটি পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেছিল তা এশিয়া তথা ভারতবর্ষে বিশাল মহীরূহের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু তারা এ ফলের গুণাগুণ বোঝেনি। এই ফল নদী পথে সাগর পাড়ি দিয়ে পশ্চিমে অর্থাৎ ইংল্যান্ডে জিনদের কাছে পৌঁছে যায়। এ ফল মিশ্রিত জল পানে তাদের (জিনদের) জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। তারা কনকদ্বীপে শত বছর শোষণ চালাল। দীর্ঘকালের শত শত বছরের মোহ নিদ্রার পর একি তীব্র জাগরণ। তারা দেখলেন, জিনেরা এক মাকাল ফলের পরিবর্তে দেশের সর্বস্ব নিয়ে গেছে, এখন জলৌকার ন্যায় তাদের বুকের অবশিষ্ট রক্ত শোষণ করছে। কনকের দৈন্যদুর্দশা দেখে তাদের হৃদয় শতধা হতে লাগল। তারপর জ্ঞান লাভের মধ্য দিয়ে ঘটল কনকদ্বীপের মুক্তি।

১৯০৫ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হয়, কিন্তু তার প্রতি রোকেয়ার সমর্থন ছিল না। তাঁর 'সিসেম ফাঁক' গল্পে দেখতে পাই, দস্যুদের গুপ্তধন পাওয়ার লোভে কাসেম সিসেম ফাঁক বলে ধনাগারে ঢুকে মনি, মুক্তা সবই নিল কিন্তু 'সিসেম ফাঁক' ভুলে যাওয়ায় আটকে পড়ল। সেকথা উল্লেখ করে রোকেয়া লেখেন—

> 'আজ ১০/১২ বৎসর হইতে দেখিতেছি আমাদের মুসলমান সমাজে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে—চারিদিকে বেশ জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, নানা প্রকার সভাসমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহারা কাসেমের ন্যায় 'অল ইন্ডিয়া মোসলেম লীগ', 'সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশন', 'অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স', অমুক ইনস্টিটিউশন, অমুক এসোসিয়েশন ইত্যাদি বহুবিধ ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির দ্বার উদঘাটনের মন্ত্রটি, অর্থাৎ স্ত্রী শিক্ষার বিষয় ভুলিয়াছিলেন বলিয়া আমি মৃদু হাস্য করিতাম। মনে মনে বলিতাম, ভ্রাতঃ! যাহাই করুন না কেন, এ রত্ন সম্ভার লইয়া সওগাত দিতে যাইবেন কোথায়? দ্বার যে বন্ধ।'

১৯২১ সালে গান্ধীজী ব্রিটিশ রাজশক্তির সাথে অসহযোগিতার ডাক দিলেন। বিলাতি পণ্য বর্জন করে দেশকে দেশি পণ্যে স্বনির্ভর করার জন্য চরকা কাটতেও নির্দেশ দিলেন। গান্ধীজীর এই ডাক রোকেয়াকে প্রভাবিত করেছিল। তার 'বলিগর্ত্ত' নামে একটি নকশায় দেখা যায় হিন্দু মেয়ে আর মুসলমান মেয়ে মিলেমিশে চরকা প্রচারের কাজ করছে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথাও এসেছে রোকেয়ার 'সৃষ্টিতত্ত্ব' নকশায়। তিনি লেখেন, 'কতকগুলি যুবক 'সত্যগ্রহ' ব্রত লইয়া মাতিয়াছে। রাজপুরুষেরা বলেন, তোমরা 'সত্যগ্রহ' ছাড়িয়া 'মিথ্যাগ্রহণ' কর। ...তাহারা ...'মিথ্যাগ্রহণ'-এর বিরুদ্ধে সত্যপ্রচার প্রয়াসে লেকচার দিয়া দেশের শান্তি নষ্ট করিয়া বেড়ান।' রোকেয়া গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন

হুবহু অনুকরণ না করে নিজের পথেই তা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রংপুর রোকেয়ার জন্মভূমি। এক সময় সেখানে এন্ডির কাপড় তৈরি হতো। এন্ডির গুটির চাষ ঘরে ঘরে হতো। মেয়েরা গুটি থেকে সুতা বার করতো। তাঁতীরা সেই সুতায় কাপড় বুনতো। ইংরেজরা এসে এ শিল্পটি ধ্বংস করে দিয়েছিল। রোকেয়া 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে এন্ডি শিল্প সম্পর্কে লিখেছেন—

> 'আমরা ত সুসভ্য হইয়া এন্ডি কাপড় পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ এন্ডি কাপড়ই 'আসাম সিল্ক' নামে অভিহিত হইয়া কোট, প্যান্ট ও স্কার্টরূপে ইউরোপীয় নর-নারীদের বর-অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল।'

তিনি আরও উল্লেখ করেন—

> 'পূর্বে নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা পূজা করিবার সময় পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন, এখন তাহাদের পুরোহিতের জন্য পৈতা আইসে জার্মানী হইতে! অধঃপতনের চূড়ান্ত আর কাহাকে বলে?'

পরনির্ভরতা তথা সাম্রাজ্যবাদনির্ভরতার আজকের চিত্র দেখলে রোকেয়া কী বলতেন তা এই বক্তব্য থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। রংপুরের এন্ডিশিল্পকে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হন রোকেয়া। ছ'মাস ধরে রংপুরের বহুজনের সাথে যোগাযোগ করে তেমন সাড়া না পেলেও শেষ অব্দি একটা গ্রামের খোঁজ পেয়েছিলেন যেখানে এন্ডিশিল্প গড়ে তোলা হচ্ছিল। বেলকা নামের স্কুলের হেডমাস্টার ছাত্রদের মধ্যে এই শিল্পের ক্লাশ খুলেছিলেন এবং তাতে এন্ডি কাপড় বোনাও হতো। রোকেয়া তাঁর 'এন্ডি শিল্প' নামক লেখায় গুটি কি করে পুষতে হয়, আনুষঙ্গিক বিষয়সহ ব্যবসায় লাভালাভেরও বিবরণ তুলে ধরেছিলেন।

রোকেয়া বিভিন্ন লেখনীতে আপসকামী-উদারপন্থী কংগ্রেসী ও অন্যান্য কথিত দেশহিতৈষীদের সমালোচনা করেছেন। 'নিরীহ বাঙ্গালী' প্রবন্ধে এদের কটাক্ষ করে কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। যেমন—

> ১। রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা 'রাজা' উপাধি লাভ সহজ;
>
> ২। শিল্পকার্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা B.Sc. ও D.Sc. পাস করা সহজ;
>
> ৩। অল্প-বিস্তর অর্থব্যয়ে দেশে কোনো বৃহৎ কার্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা সহজ;
>
> ৪। প্রতিবেশী দরিদ্রদের শোক দুঃখে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা বিদেশীয় বড় লোকদের মৃত্যু দুঃখে 'শোক সভার' সভ্য হওয়া সহজ;
>
> ৫। দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ;
>
> ৬। স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ;

৭। স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা মুখশ্রীর প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য্য বর্ধন করা (অর্থাৎ Healthy & cheerful হওয়া) অপেক্ষা (শুষ্কগণ্ডে) কালিডোর, মিল্ক অব রোজ ও ভিনোলিয়া পাউডার (Kalydore, milk of rose ও Vinolia powder) মাখিয়া সুন্দর হইতে চেষ্টা করা সহজ;
৮। কাহারও নিকট প্রহারলাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহুবলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ ইত্যাদি।

এদের মধ্যে খান বাহাদুর, রায়বাহাদুর খেতাব লাভের জন্য এরা ব্রিটিশদের কাছে নতজানু হয়ে থাকতো। রোকেয়া এই সব পদবীকে বলেছেন 'লাঙ্গুল' অর্থাৎ লেজ। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আপসহীন বিপ্লবী ধারার সংগ্রামীরা যখন সশস্ত্র মোকাবিলা করতে শুরু করলো এবং গান্ধীবাদীরাও 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের হুংকার ছাড়লো তখন এই খেতাবধারীরা তার বিরুদ্ধে সরাসরি ইংরেজের পক্ষ না নেয়ায় তাদের খেতাব কেড়ে নেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছিল। রোকেয়া বিদ্রূপ করে 'আপীল' কবিতায় লেখেন—

'প্রাণে মরি সেও ভাল,
শতবার মৃত্যু ভাল,
লাঙ্গুল-বিরহ কিন্তু সহিতে না পারি!
বোবার অরাতি নাই
এই সত্য জানি তাই
নীরব ছিলাম মোরা ল্যাজ-প্রাপ্তগণ।
একি শুনি অকস্মাৎ
বিনা মেঘে বজ্রপাত
মৌন দোষে হবে নাকি লাঙ্গুল কর্তন!'

আবার ১৯০৮ সালে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, কানাইলালদের সাহসী আত্মদানের পরিপ্রেক্ষিতে লিখেন—

'গত ১৩১০ সালে 'নিরীহ বাঙ্গালী' লিখিত হইয়াছে। সুখের বিষয় বর্ত্তমান সালে আর বাঙ্গালী 'পুরুষিকা' নহেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন শুভ পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা কে জানিত। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন আমরা সাহসী বাঙ্গালী।'[৬৪]

ব্রিটিশরা বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী বলতো, রোকেয়ার কাছে তাঁরা ছিলেন বিপ্লবী, বীর। তাঁদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন এবং অসারতার কথা তাঁর 'মুক্তিফল'-এ

৬৪. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর:প্রথম খণ্ড, নিরীহ বাঙ্গালী-এর পাদটিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২৫

ফুটে উঠেছে একভাবে। বাংলার দুই কৃতি সন্তান একজন ক্ষুদিরাম ও অন্যজন প্রফুল্ল চাকী প্রাণদান করে পরাধীন ভারতবাসীকে জাগিয়ে অমরত্ব লাভ করেছিলেন। এ সময়ে সরকার নানা অজুহাতে কারারুদ্ধ করে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্তসহ ৩৪ জন বীর বাঙালিকে। হুগলীর দুঃসাহসী তরুণ কানাই জেলের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামের এক বিশ্বাসঘাতক ব্রিটিশ চরকে হত্যা করেন। ইংরেজের বিচারে কানাই ফাঁসিতে গলা মেলে নিজেকে উৎসর্গ করেন ১০ নভেম্বর ১৯০৮ সালে। ব্যথিত রোকেয়া এই বীরের উদ্দেশ্যে রচনা করেন 'নীরুপম বীর' নামক কবিতা। বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘের অন্যতম নিদর্শন এ কবিতায় রোকেয়া লিখেছেন :

'বিচারক বলে,'কানাই তোমার
গলায় পড়বে ফাঁসি'!
শুনি' শ্যামলাল বেপরোয়া ভাবে
হাসিল ঘৃণার হাসি।
রাখিতে পরের পরান যে জন
দেয় নিজে বলিদান,
সে কি বিচলিত ফাঁসির আদেশে?
মৃত্যু তুচ্ছজ্ঞান।
এ মর-জগতে কানাইয়ের তুল
কে আছে কোথায় আর?
...মরিয়া কানাই হইবে অমর
সাধ্য কি বধে তারে?
...শ্যাম-ঋণ-পাশে রয়েছে যে বাঁধা
সকল বঙ্গবাসী,
অনেকে তাদের করিল প্রণতি
শ্যামে কারাগারে আসি'
জগতে শ্যামের বিপুল আদর
হ'ল না বর্তমানে,—
যদিও ভকতি নীরব প্রবাহ
বহে বাঙ্গালী প্রাণে!
... প্রাতঃস্মরণীয় কানাই মোদের,
বল বল 'বন্দে শ্যাম'।'

বিপ্লবী সংস্কারক রোকেয়া

নিয়মের অধীন প্রবাহমান এই জগত সংসারে চলার গতি প্রকৃতি সব সময় একই রকম থাকে না, একই ধারায় চলেও না। কখনও সরল রেখায়, কখনও আঁকাবাঁকা পথে, কখনও ধারাবাহিকতায়, কখনও উল্লম্ফনে, উত্থানে-পতনে এবং একটি প্রয়োজনের বিকাশে অন্যটির বিনাশে তা এগিয়ে চলে। মানুষের সৃজনীশক্তি তথা উৎপাদনের শক্তি বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে উৎপাদনকেন্দ্রিক মানব সম্পর্ক-সম্বন্ধ যখন পিছিয়ে পড়ে বা বৈরিরূপ ধারণ করে তখনই মৌলিক এক রূপান্তর বা বিপ্লবাত্মক সামাজিক পরিবর্তন প্রয়োজন পড়ে। সে পরিবর্তনের ঐতিহাসিক তাগিদে শুরু হয় প্রথমে চিন্তাজগতে জঙ্গম ক্রিয়া, ঘটতে থাকে সমাজমননে ভাবনাগত সংঘাত। যা কিছু চলছে তার সাথে তাল মিলিয়ে, সামান্য কিছু অদলবদল করে জোড়াতালি দিয়ে সভ্যতা বিকাশের সে চাহিদা পূরণ করা যায় না। নতুন দিনের নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এমন কিছু মানুষের তখন আবির্ভাব ঘটে যারা সাধ্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে, জীবন উৎসর্গ করে, গ্লানি-লাঞ্ছনা-আঘাত-অপমান সহ্য করে লক্ষ কোটি মানুষের মাঝে অন্তর্নিহিত সুপ্ত অগ্রসর ভাবনাগুলোর নির্যাস নিয়ে তার সার সংকলন করে মানুষের সামনে তুলে ধরেন—তারাই সময়ের পথপ্রদর্শক হন। সময়ের তুলনায় এগিয়ে থাকেন বলে জীবনকালে অনেকেরই তেমন কদর হয় না আবার আগামীর পথপ্রদর্শক বলে তাদের যথামূল্য না দিয়ে পরবর্তী প্রজন্ম পথ চলতেও পারে না। রোকেয়া তেমন একজন বিপ্লবী পথপ্রদর্শক। জীবদ্দশায় তাঁর তেমন মূল্যায়ন হয়নি। আজ নারীমুক্তি, মানবমুক্তি, সমাজপ্রগতির প্রশ্নে তাঁর মূল্যায়ন অর্থাৎ তাঁর জীবন ও সংগ্রামের শিক্ষা এতটাই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে যে ঘরে ঘরে নির্যাতিত মানুষের, বিশেষভাবে নারীসমাজের আকুতিতে তা ধ্বনিত হচ্ছে।

রোকেয়া বলেছেন, অসহায় অবস্থায় পতিত হয়ে নারী শুধু চোখের জল ফেলেছে এতদিন, আর নয় জল, এবার চোখ থেকে অনল বর্ষণ করে কুসংস্কারের জঞ্জাল পুড়িয়ে ছাই করে দিতে হবে। নত হওয়া নয়, বিদ্রোহ কর, অজ্ঞতা-মূর্খতার বশ্যতা কিংবা আস্ফালন নয়, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও ঐক্যের শক্তিতে রুখে দাঁড়াও। নিজেরা কুসংস্কারের যে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ তা থেকে মুক্ত হও। রোকেয়া তাঁর একটি লেখায় মানসকুমারী বসুর কবিতা উদ্ধৃত করেছিলেন—

'কাঁদ তোরা অভাগিনী। আমিও কাঁদিব,
আর কিছু নাহি পারি, ক'ফোঁটা নয়ন-বারি
ভগিনী! তোদেরি তরে বিজনে ঢালিব
যখন দেখিব চেয়ে, অনূঢ়া, 'প্রাচীনা মেয়ে'

কপালে যোটেনি বিয়ে–তখনি কাঁদিব
যখন দেখিব বালা সহিসে সতিনী-জ্বালা
তখনি নয়ন জলে বুক ভাসাইব।
সধবা বিধবা-প্রায় পরান্ন মাগিয়া খায়
দেখিলে কাঁদিয়া তার যমেরে ডাকিব
এ তুচ্ছ এ হীনপ্রাণ দিতে পারি বলিদান
তোদেরি কল্যাণে বোন। কিন্তু কি করিব?
কাঁদিতে শকতি আছে, কাঁদিয়া মরিব'।[৬৫]

জীবনের এই পরাজয় রোকেয়া মানতে রাজী নন। তিনি বলেন—

> 'আমার ভগ্নীটি অবশেষে সবখানি শক্তি কেবল 'কাঁদিয়া মরিতে' ব্যয় করিলেন! বাস! ঐরূপ বিজনে অশ্রু ঢালিয়াই আমরা এমন অবলা হইয়া পড়িয়াছি।'[৬৬]

নারীসমাজের প্রতি অসীম দরদে তিনি বলেন—

> 'ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন, অগ্রসর হউন। বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই, বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই, বল কন্যে! আমরা জড়োয়া অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ। আর কার্যতঃ দেখাও যে আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক।'[৬৭]

যুগে যুগে সত্য প্রকাশের নির্মম ফলাফল ভোগের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত অনেক, যেমন বিজ্ঞানী গ্যলিলিও পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এবং পৃথিবী নয় সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্র, ধর্মীয় মতের বিপরীত এই মত প্রকাশের অপরাধে কারাগারে অশেষ নির্যাতন শেষে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সেই ঘটনা উল্লেখ করে রোকেয়া বলেন—

> 'অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনী! প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য 'কৎল' এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি! (এবং ভগ্নিদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্তে জাগিতেই হইবে। বলিয়াছি ত কোনো ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে (but nevertheless it

৬৫. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, গৃহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৫৩
৬৬. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, গৃহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৫৩
৬৭. রোকেয়া রচনাবলী, সুবেহ্ সাদেক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২৪২

(Earth) does move) আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে।'[৬৮]

নর-নারী নির্বিশেষে মানুষে মানুষে সম কর্মক্ষেত্র, সমান সুযোগ, লিঙ্গ বিচারে নয়—মেধা যোগ্যতার মানদণ্ডে কর্ম নির্ধারণ ও সমতা বিধান ছাড়া স্বাধীনতা হয় না। অধীনতামুক্ত স্বাবলম্বী সামাজিক গতিই তো স্বাধীনতার প্রকৃতি। রোকেয়া বলেন—

'স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে। ...পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডিকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডিম্যাজিস্ট্রেট, লেডিব্যারিষ্টার, লেডিজজ সবই হইব। ...উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামীর' গৃহকার্য্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না? ...যদি বল, আমরা দুর্ব্বলভুজা, মুর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্ব্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না? ...পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা—উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে—সর্ব্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। ...আমাদের উচিত যে তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝাবিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিনী, সহধর্মিনী ইত্যাদি হইয়া তাহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্ম্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।'[৬৯]

অসহায়ের অবলম্বন হিসেবে আশ্রয়, অনুগ্রহ গ্রহীতাকে যেমন পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দেয় তেমনি দাতা-গ্রহীতা উভয়ের দূরত্বকে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে। রোকেয়া বলেন—

'পুরুষজাতি বলেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে 'বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া' রাখিয়াছেন এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব

৬৮. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, স্ত্রীজাতির অবনতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২০
৬৯. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, স্ত্রীজাতির অবনতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২১

না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া, ঢলিয়া, বহিয়া যাইতেছি। ফলতঃ তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান সূর্য্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশঃ মরিতেছি। ...তাহাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ।'[৭০]

নর-নারী পরস্পর সমমর্যাদা, সমমানের দক্ষতা ও স্বাধীন স্বত্ত্বার সম্মতিতে ভালবাসার সম্পর্ক ও পারিবারিক ঐক্য গড়ে তোলে আর সমতালে কদমে কদম মিলিয়ে সমগ্রের স্বার্থের অংশ হিসেবে সংসার স্রোতে এগিয়ে চলে। কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী নর-নারীর অসমতা জীবন চলার পথে ছন্দপতন ঘটায়। জৈবিক আসক্তি একঘেঁয়ে জীবনের অবসাদ ডেকে আনে। বৈষম্যের ভারসাম্যহীনতা জীবনের ওপর ভারবোঝা চাপিয়ে দেয়। অর্ধেক জনশক্তি কর্তৃত্বশীল পুরুষদের সদম্ভ পদচারণা আর কোলাহলে তাদের ভোগবাদী উগ্রতাজনিত নৈতিক-ধস যেমনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, তেমনি বাকি অর্ধেক অবরুদ্ধ নারীর জীবনহীন জীবন পাষাণস্তূপের মতো চলার পথে বাধার বিন্ধ্যাচল তৈরি করে। রোকেয়া বলেন—

'প্রভুদের বিদ্যার গতির সীমা নাই, স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর 'বোধোদয়' পর্যন্ত! স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন! স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ নক্ষত্রমালা-বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ধারণ করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল, ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন। বলি জ্যোতির্ব্বেত্তা মহাশয়, আপনার পাশে আপনার সহধর্মিনী কই?'[৭১]

শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত মানুষ মানবাধিকার বঞ্চিতই শুধু হয় না, তারা যুগোপযোগী ও আধুনিকতা বর্জিত আদিমতায় আটকা পড়ে থাকে। নারীদের এই পশ্চাদদশা এগিয়ে চলা পুরুষদের গতিরোধেরও অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। রোকেয়া বলেন—

'আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল

৭০. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, স্ত্রীজাতির অবনতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ১৫

৭১. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, অর্দ্ধাঙ্গী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২৮

> কলেজ এক প্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোনো উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করেন।'[৭২]

তিনি 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে আরও বলেন,

> 'স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে তাঁহারা 'স্ত্রীশিক্ষা' শব্দ শুনিলেই 'শিক্ষার কুফলের' একটা ভারী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লান বদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোনো কল্পিত দোষ শত গুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ 'শিক্ষা'র ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে 'স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার'।'

কর্মক্ষেত্রে সমকাজের সমমজুরি নারীরা পাননা। এটাও নারীর প্রতি একটা পশ্চাদপদ এবং বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। শতবর্ষ পূর্বে রোকেয়া যে বিষয়টিকে তুলে ধরেছিলেন তা আজও স্বাধীন সভ্য দেশে বিদ্যমান। তিনি বলেছিলেন—

> 'কার্য্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশী, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে ২ বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোক ১ পায়। চাকরের খোরাকী মাসিক ৩ আর চাকরানীর খোরাকী ২।'[৭৩]

জবরদস্তি করে মানুষকে দাস বানানো যায় কিন্তু দাসদের মধ্যে দাসত্ব মানসিকতার একটা জমি তৈরি করতে না পারলে তাকে দাস হিসেবে বেশিদিন আটকে রাখা যায় না। আবার যারা অন্যকে দাসে পরিণত করে তারাও নিজেদের মধ্যে প্রবৃত্তিগত বিভিন্ন মাত্রার দাসত্ব মানসিকতার লালন না করলে তা করতে পারে না। নারীরা একদিন জবরদস্তির শিকার হয়ে দাসত্ব বরণ করেছিল কিন্তু কালক্রমে বহুদিনের অভ্যস্ততায় নিজেরাও যখন জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে তা মেনে নিয়েছে তখন দাসত্ব পীড়া আর তাদের কাছে তেমন যন্ত্রণাদায়ক মনে হয় না। রোকেয়া বলেছেন—

> 'অনেকে মনে করেন যে পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয় স্ত্রীজাতি

৭২. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, স্ত্রীজাতির অবনতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ১৮
৭৩. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, স্ত্রীজাতির অবনতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২১

প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জ্জিত ধন ভোগে বাধ্য হয়। এবং সেইজন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্য্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্ম্মণ্য পুরুষেরাই স্বামী থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জ্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারণীকে বিবাহ করেন, তিনিও স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন! এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না। ...বিপৎসঙ্কুল সংসার হইতে সর্ব্বদা সুরক্ষিতা আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা, বল একেবারে হারাইয়াছি। আত্মনির্ভর ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য হইতে সামান্যতর বিপদে পড়িলে আমরা গৃহকোণে লুকাইয়া গগণভেদী আর্ত্তনাদে রোদন করিয়া থাকি। ভ্রাতৃমহোদয়গণ আবার আমাদের 'নাকি কান্নার' কথা তুলিয়া কেমন বিদ্রূপ করেন, তাহা কে না জানে? আর সে বিদ্রূপ আমরা নীরবে সহ্য করি। আমরা কেমন শোচনীয় রূপে ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলে ঘৃণায় লজ্জায় মৃতপ্রায় হই। ব্যাঘ্র ভল্লুক ত দূরে থাকুক, আরসোলা জলৌকা (জোঁক) প্রভৃতি কীট পতঙ্গ দেখিয়া আমরা ভীতিবিহ্বলা হই! এমনকি অনেকে মূর্চ্ছিতা হন! একটি ৯/১০ বৎসরের বালক বোতলে আবদ্ধ একটি জলৌকা লইয়া বাড়ীশুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আমোদ ভোগ করে। অবলাগণ চীৎকার করিয়া দৌড়িতে থাকেন, আর বালকটি সহাস্যে বোতল হস্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এমন তামাসা আপনারা দেখেন নাই কি? আমি দেখিয়াছি—আর সে কথা ভাবিয়া ঘৃণায়, লজ্জায় মরমে মরিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, সে সময় বরং আমোদ বোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সে কথা ভাবিলে শোণিত উত্তপ্ত হয়। হায়! আমরা শারীরিক বল, মানসিক সাহস, সব কাহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি? আর এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিবার শক্তিও আমাদের নাই।'[৭৪]

সমাজবদ্ধ মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা নির্ভরতা সম্বন্ধ সম্পর্ক ছাড়া চলতে পারে না। পারস্পরিক সহায়তা আর পরস্পর একে অপরের প্রতি অধীনতা এক হতে পারে না। এই বিষয়ে 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে রোকেয়া বলেন—

'স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ 'প্রভু' হইতে পারে না। কারণ জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোনো না কোনো প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্য প্রার্থী, মেঘও সেইরূপ তরুর সাহায্য

৭৪. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, স্ত্রীজাতির অবনতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ১৬, ১৭, ২০

চায়। জল বৃদ্ধির নিমিত্ত নদী বর্ষার সাহায্য পায়, মেঘ আবার নদীর নিকট ঋণী। তবে তরঙ্গিনী কাদম্বিনীর 'স্বামী' না কাদম্বিনী তরঙ্গিনীর 'স্বামী'? এ স্বাভাবিক নিয়মের কথা ছাড়িয়া কেবল সামাজিক নিয়মে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা তাহাই দেখি। কেহ সূত্রধর, কেহ তন্তুবায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিষ্টার ডাক্তারের সাহায্য প্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিষ্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিষ্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিষ্টার ডাক্তারের স্বামী? যদি ইহাদের কেহ কাহাকে 'স্বামী' বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতিগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে 'স্বামী' ভাবিবেন কেন?'

মানবতাবাদী রোকেয়া

বেগম রোকেয়া মনে করতেন ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম। ধর্মকে তিনি বদ্ধ জলাশয়ের উপযোগিতায় বিচারের বদলে প্রবাহমান নদীর বয়ে চলার গতিতে জীবনের সঙ্গতি অসঙ্গতির নিরিখে বুঝতে চেয়েছেন। সমাজ বিকাশের এক একটি ঐতিহাসিক স্তরে বহুঈশ্বরবাদী, একেশ্বরবাদী বিভিন্নরূপ ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। শ্রেণিসমাজে শাসকশ্রেণি যাজকশ্রেণির সহায়তায় এবং নানা কৌশলে ধর্মকে তাদের শোষণের এবং প্রতারণার হাতিয়ার করেছে। আবার শোষকের অসহনীয় নির্যাতনের মুখে শাসকদের শক্তির চেয়েও বড় শক্তির কল্পনামূর্তি দাঁড় করিয়ে নিপীড়িতশ্রেণি ধর্ম বা ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে শোষণ-অত্যাচার-বৈষম্যের জ্বালার উপশম খুঁজেছে। যেজন্য মনীষী কার্ল মার্কস বলেছিলেন—

> 'ধর্ম হলো নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, ঠিক যেমন সেটা হলো আত্মাবিহীন পরিবেশের আত্মা।' এবং একইভাবে 'ধর্ম হলো জনগণের জন্য আফিম।'[৭৫]

বেগম রোকেয়া 'নূর-ইসলাম' প্রবন্ধে আয়ারল্যান্ডের অধিবাসী থিওসোফি'র প্রচারক মিসেস এনি বেশান্তের 'ইসলাম' শীর্ষক বক্তৃতা উল্লেখ করেছেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে এনি বেশান্ত বলেন—

> 'আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি আপনাদিগকে চারিটি প্রধান ধর্ম্মের, অর্থাৎ বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়, হিন্দু এবং অনলপূজার বিষয়ে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনটি শ্রেষ্ট ধর্ম্মের, অর্থাৎ ইসলাম, জৈনমত, এবং শিখধর্ম্মের আলোচনা রহিয়া গিয়াছিল। এই তিন ধর্ম্ম—যাহা ভারতবর্ষের প্রধান সাতটী ধর্ম্মের অন্তর্গত—ইহাদের পরস্পরে এত অনৈক্য দেখা যায় যে, ইহারা একে অপরের রক্ত-পিপাসু হইয়া উঠে এবং

৭৫. ধর্ম প্রসঙ্গে, মার্কস-এঙ্গেলস, পৃ. ৪০

দুইজনের মনের মিলনের পক্ষে এই ধর্ম্ম-পার্থক্য এক বিষম অন্তরায় হইয়া আছে। আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, ভারতবর্ষ হেন দেশে যদি সকলে চক্ষু হইতে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবরণ উন্মোচন করিয়া ন্যায়চক্ষে দৃষ্টিপাত করতঃ চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে আমরা প্রকৃতপক্ষে একই প্রভুর উপাসনা বিভিন্ন প্রণালীতে করিতেছি— একই প্রভুকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ও ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিতেছি।'

বেগম রোকেয়া সেই বক্তৃতার প্রসঙ্গ টেনে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পটভূমি ব্যাখ্যা করে 'মতিচূর' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন যে, ধর্মীয় কিংবা যে-কোনো বিধিবিধানই একটা নির্দিষ্ট সময় ও সমাজের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বাস্তবতা এবং প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত ও তার ওপর ক্রিয়াশীল হয়। কোনো শাস্ত্রমতকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে ওই সময়ে বিরাজিত এবং সমাজের গভীরে প্রোথিত কোনো বিশ্বাস-ভাবনাকে হুবহু নিয়ে কিংবা পরিমার্জিত করে প্রচারকগণ মানবকল্যাণের স্বীয় ভাবনা বাস্তবায়নে ব্রতী হন। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের খেয়াল-খুশি বা লীলাখেলার বিষয়টি ভক্তিমূলক আতিশয্য প্রকাশের বেশি কিছু নয়। রোকেয়া ধর্মের উদ্ভব তত্ত্বের উপর কিছুটা আভাস দিয়ে তদানীন্তন আরব সমাজের অবস্থা উল্লেখ করে বলেন—

'কোন ধর্ম্ম পরীক্ষা করিতে হইলে, আমাদিগকে চারিটি বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। সর্ব্বপ্রথম সেই ধর্ম্মের উৎপত্তির ইতিহাস, যাহার প্রভাব তাহাতে (সেই ধর্ম্মে) লুক্কায়িত থাকে। দ্বিতীয়, তাহার প্রকাশ্য বা বাহ্যিক মত অথবা শাখা পল্লব, যাহার সহিত সাধারণে সম্পর্কে রাখে। তৃতীয়, ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য, যাহাতে সাধারণতঃ মানবের আপন অহং বা অস্তিত্বজ্ঞানের ভাণ্ডারের সহিত মিশিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আমি এই কষ্টিপাথরে ইসলামকে পরীক্ষা করিয়া আপনাদিগকে দেখাইতে চাই যে, সর্ব্বপ্রথমে আরব ও শামদেশের অবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দেখুন, সে দেশের কি দশা ছিল।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন সমস্ত আরব, শাম ও আজমদেশে অসভ্যতার ঘোর অন্ধকারে কুসংস্কারের প্রবল ঝঞ্ঝানিল বহিতেছিল; যুদ্ধকলহ ও পরস্পরের রক্তারক্তি একদলকে অন্য দল হইতে পৃথক করিতেছিল; হিংসা দ্বেষ এমন প্রবল ছিল যে, একই বিষয়ের ঝগড়া কয় পুরুষ পর্য্যন্ত চলিত; যথা এক ব্যক্তি কোন বিষয় লইয়া অন্য একজনের সহিত বিবাদ করিল, অনন্তর শত বছর পরে একের পৌত্র অপরের পৌত্রকে শুধু এই অজুহাতে হত্যা করিত যে, 'ইহার পিতামহ আমার পিতামহের শত্রু ছিল!' ইহা সেই আরব দেশ— সেখানে কেবল এই কথায় যুদ্ধ আরম্ভ হইত যে, 'তোমার উষ্ট্র আমার উষ্ট্রকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল কেন?' বাস,

এই সামান্য কারণে রক্তনদী প্রবাহিত হইর্ত—শবরাশি স্তূপীকৃত হইত! এ সেই আরব দের্শ—যেখানে নিষ্ঠুর পিতা, মাতার ক্রোড় হইতে শিশুকন্যাকে কাড়িয়া লইয়া গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া আসিত। আর নিরুপায় মাতা আপন স্বাভাবিক মাতৃস্নেহপূর্ণহৃদয়ের অসহ্য বেদনা লইয়া মরমে মরিয়া থাকিত। স্ত্রীলোক হওয়ার দরুণ পাষণ্ড স্বামীর ঐ নির্মম অত্যাচারে আপত্তি করিতে পারে, এতটুকু ক্ষমতাও তাহার ছিল না। কাহাকেও জামাতা বলিতে না হয়, এই জন্য কন্যা হত্যা করা হইত। ইহা সেই দেশ, যেখানে ...পৌত্তলিকতা বিরাজমান ছির্ল—ঘরে ঘরে নতুন দেবতা; এক ঠাকুর আবার অন্য ঠাকুরের প্রাণের শত্রু! প্রতিমার সম্মুখে নর বলিদান ত নিত্য ক্রীড়া ছিল; যেখানে মানব জাতির প্রতি স্নেহ মমতার পরিবর্ত্তে বিলাসিতা ও আত্মপরায়ণতা পূর্ণ মাত্রায় রাজত্ব করিত। যেকোন প্রবল ব্যক্তি আপন দুর্ব্বল প্রতিবেশীকে বিনা কারণে কিম্বা অতি সামন্য কারণে হত্যা করিয়া ফেলিত; তাহার ঐ দুষ্ক্রিয়ায় বাধা দেবার লোক ত দূরে থাকুক, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবারও কেহ ছিল না।

তদনীন্তন আরবে বিলাসিতার ও অন্যান্য 'মকারাদি' কুক্রিয়ার অন্ত ছিল না; এক স্বামী ভেড়া ছাগল প্রভৃতি পশুর ন্যায় অসংখ্য ভার্য্যা গ্রহণ করিত; আর এই বিষয়ে গৌরব করা হইত যে অমুক ধনী ব্যক্তি এত অসংখ্য স্ত্রীর স্বামী। ঈশ্বরের সৃষ্টি—স্ত্রীজাতি এমন জঘন্য দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধা ছিল যে, তাহারা নিতান্ত অসহায় গৃহপালিত পশুর ন্যায় জীবনযাপন করিত। মোটের উপর এমন কোন নিকৃষ্ট পাপ ও জঘন্য দোষ নাই, যাহা তৎকালীন আরবে না ছিল।'[৭৬]

এ পরিস্থিতিই ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব অনিবার্য করে তুলেছিল। তাই আমরা দেখি রোকেয়া বলেন—

'পয়গম্বরদের ইতিহাসে শুনা যায়, জগতে যখনই মানুষ বেশী অত্যাচার, অনাচার করিয়াছে, তখনই এক একজন পয়গম্বর আসিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছেন। আরবে স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিল, আরববাসীগণ কন্যা-হত্যা করিতেছিল, তখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কন্যাকুলের রক্ষক স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধ ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। সে আদর, সে স্নেহ জগতে অতুল।'[৭৭]

এভাবে সকল ধর্মপ্রচারকগণই তাঁদের সময় ও সমাজের সৃষ্টি। রোকেয়া বলেন—

৭৬. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : দ্বিতীয় খণ্ড, নূর-ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৬৩, ৬৪
৭৭. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, অর্দ্ধাঙ্গী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৩০

'হযরত মোহাম্মদ, হযরত ইসা, হযরত মুসা, মহর্ষি বুদ্ধদের্ব—সকলে একই অট্টালিকায় আছেন। তাঁহারা এক জাতি হইতে অন্য জাতিকে ভিন্ন মনে করেন না। আর আমরা, যে তাঁহাদের সামান্য শিষ্য তাঁহাদের শিশু সন্তার্ন—আমাদের উচিত যে তাঁহাদের বিশ্বপ্রেমের সারতত্ত্ব লাভ করি। প্রেম দ্বারাই তাঁহারা আমাদের নিকটবর্তী হন। পয়গম্বর মোহাম্মদ সাহেব স্বেচ্ছায় স্বীয় শিষ্যের নিকটবর্তী হন না, যে পর্যন্ত শিষ্য মনের কঠোরতা দূর না করে এবং তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার না হয়। ...যত পয়গম্বর মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলের উপরই আমাদের দাবি (হক) আছে। আমরা তাঁহাদের ভালবাসি, তাঁহাদের সম্মান করি। ...'[৭৮]

ধর্ম প্রচারকগণ তাদের যুগে বা সময়ে একটা উন্নত নৈতিকতাবোধ ও নিষ্ঠাব্রত পালন না করলে, মানুষের জন্য সম্পূর্ণ নিবেদিত না হলে শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারতেন না। রোকেয়া এইসব মহাপ্রাণ মানুষদের তাদের কালে ঐতিহাসিক অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি অনেকটা রামমোহনের মতোই বলেছেন যে, আমি ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিনি। কিন্তু যে সামাজিক সংস্কার-কুসংস্কার সমাজ-সভ্যতা বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে বিধি-বিধানের যুপকাষ্ঠে সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদের বলি দেওয়া হচ্ছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। এখন যদি ধর্মকে বর্ম হিসেবে নিয়ে কেউ আক্রমণ চালাতে আসে তাহলে শুধু ধর্মের বাণী বলে কী সভ্যতার দাবিকে অস্বীকার করা চলে? কোনো সত্যই শ্বাশত নয়, তারও স্থান-কাল-প্রেক্ষিত আছে, উপলব্ধির তারতম্য আছে, রূপান্তর আছে। ইসলাম ধর্মের নবী মনীষী হযরত মোহাম্মদ সম্পর্কে তিনি বলেন—

'...আপনারা নিজেরাই বেশ জানেন যে, কোন বিজ্ঞ বক্তৃতানিপুণ ব্যক্তি কোন সভা সমিতিতে গিয়া বেশ ঝাড়া দুই ঘণ্টা উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রভাবে শ্রোতৃবর্গকে মোহিত ও চমৎকৃত করিয়া স্বমতে তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারে—যেহেতু সে সময় লোকে তাহাকে কেবল বক্তৃতা মঞ্চেই দেখে; তাহার আভ্যন্তরীণ জীবনের অবস্থা কিছু জানে না। কিন্তু ইহা বড় কঠিন, এমনকি অসম্ভব যে নিজের স্ত্রী, কন্যা, জামাতা প্রভৃতি অতি নিকটবর্ত্তী আত্মীয়গণ তাহার সত্যতার সাক্ষ্য দান কর্রে—যদি সে ব্যক্তি বাস্তবিক তদ্রূপ নির্ম্মল ও সত্যপর না হয়। আমাদের মতে ইহারই নাম 'পয়গম্বরী' ...এখন আমি আপনাদিগকে আরবীয় পয়গম্বরের প্রতি যেসব অন্যায় দোষারোপ করা হয়, তাহার বিষয় বলিতেছি। ...তাঁহার একতম দোষ এই বলা হয় যে, তিনি জীবনের শেষভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ৯ জন মহিলার পাণিগ্রহণ

৭৮. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : দ্বিতীয় খণ্ড, নূর ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৭৯

করেন। তিনি বিবাহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আপনারা কি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, সেই ব্যক্তি, যিনি ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কোনো প্রকার 'মকারাদি' কু অবগত ছিলেন না, পরে নিজের অপেক্ষা অনেক অধিক বয়স্কা একটি বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহারই সহিত অতি সুখে জীবনের ২৬টি বৎসর যাপন করিলেন, তিনি শেষ বয়সে, যখন মানুষের জীবনীশক্তি নির্ব্বাপিত প্রায় হয়, শুধু আত্মসুখের জন্যই যে কতকগুলি বিবাহ করিবেন, তাহা কি সম্ভব? যদি ন্যায় বিচারের সহিত বিবেচনা করেন, তবে আপনারা বেশ জানিতে পারিবেন—সে বিবাহের উদ্দেশ্য কি ছিল। প্রথমে দেখিতে হইবে তাঁহারা (হযরতের পত্নীগণ) কোন শ্রেণির কুলবালা ছিলেন, আর কেনই বা তাঁহাদের রসুলের প্রয়োজন ছিল। কতিপয় নারী এরূপ ছিলেন যে তাঁহাদের বিবাহের ফলে রসুলের পক্ষে 'নূর ইসলাম' প্রচারের সুবিধা হইল। আর কয়েকজন এরূপ ছিলেন যে, বিবাহ ব্যতীত তাঁহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অন্য কোন উপায় ছিল না।'[৭৯]

স্থানকাল পরিপ্রেক্ষিতে সত্য বিচারের মানদণ্ড রোকেয়ার কাছে ছিল, তাই তিনি বর্তমানের সত্যের বিচারে অতীতের সত্যাসত্যকে খারিজ করে দেননি। বরং নানা দিক থেকে তার অসারতার দিকগুলিও বাস্তব বিজ্ঞানসম্মত রূপে উপস্থিত করেছেন। একদিনের ধর্মীয় আচার-বিশ্বাস সংস্কার যখন বর্তমানের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, ভবিষ্যতের অগ্রযাত্রার সামনে বাধা রূপে উপস্থিত হয়েছে তাকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করতে এবং অপসারিত করতে চেয়েছেন। যে জন্য রোকেয়াকে বলতে হয়েছে—

'আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই; তাহার কারণ এই বোধ হয় যে, যখনই কোনো ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছে, তখনই ধর্ম্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। অবশ্য একথা নিশ্চয় বলা যায় না, তবে অনুমানে ঐরূপ মনে হয়। আমরা প্রধানতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহা পরে ধর্ম্মের আদর্শ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। ...আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোনো ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমার আলোচ্য বিষয় নহে। ধর্ম্মে যে সামাজিক আইন-কানুন বিধিবদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব, সুতরাং ধার্ম্মিকগণ নিশ্চিন্তে থাকুন। ...কেহ বলিতে পারেন যে, তুমি সামাজিক কথা বলিতে গিয়া ধর্ম্ম লইয়া টানাটানি কর কেন? তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, ধর্ম শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে। ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমনীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই 'ধর্ম্ম' লইয়া

৭৯. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর:দ্বিতীয় খণ্ড, নূর-ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৬৮, ৭৫

টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য ধার্ম্মিকগণ আমাকে ক্ষমা করিতে পারেন। ...ভগিনী, তোমরা দেখিতেছ, এই ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি পুরুষ রচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পাও, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়তো তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতে। ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বর প্রেরিত বা ঈশ্বরাদিষ্ট নহে। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত কেবল এসিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত যাইয়া 'রমণী জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এসিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় কি তাহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জল বায়ু ত সকল দেশেই আছে—কেবল দূতগণ সর্ব্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? ...যাহা হউক এখন আমরা আর ধর্ম্মের নামে নতমস্তকে নরের প্রভুত্ব সহিব না। আরও দেখ, যেখানে ধর্ম্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। ...যেখানে ধর্ম্ম বন্ধন শিথিল, সেখানে রমনী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনা অর্থাৎ পুরুষ্যের সমতুল্যা। এ স্থলে ধর্ম্ম অর্থে ধর্ম্মের সামাজিক বিধান বুঝাইতেছে।'[৮০]

রোকেয়া সুশিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী হওয়ার এবং আত্মশক্তি জাগরণের মধ্য দিয়ে নারীর মুক্তি এবং মানবমুক্তি কামনা করেছেন। পুরুষের প্রয়োজনে একটা সময় পর্দা বা অবরোধের অন্যায় অযৌক্তিক প্রথা নারীদের ওপর চাপানো হয়েছিল। নারীদের আত্মমর্যাদার উন্মেষ ও লড়াইয়ের পরিবর্তে পুঁজিবাদ-সৃষ্ট ভোগবাদ ও বাজারি পণ্য-মানসিকতার তাড়নায় কিংবা ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা লাভের তাগিদে ওই পর্দা-অবরোধ উঠে গেলেই কি তা নারীস্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করবে? রোকেয়া বলেছেন, না। তিনি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে যে লড়াই চালিয়েছেন তা কিছু আবরণ-আভরণ বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, তার মর্মবস্তু অন্যত্র ছিল। তিনি 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বলেছেন—

'এইখানে গোঁড়া পর্দাপ্রিয় ভগ্নীদের অবগতির জন্য দু একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করি। আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। কেহ যদি আমার 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে পর্দাবিদ্বেষ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য দেখিতে না পান, তবে আমাকে মনে করিতে হইবে আমি নিজের মনোভাব উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই, অথবা তিনি প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই। সে প্রবন্ধে প্রায় সমগ্র নারীজাতির উল্লেখ আছে। সকল সমাজের মহিলাগণই কি অবরোধে বন্দিনী থাকেন?

৮০. রোকেয়া রচনাসংগ্রহ, আমাদের অবনতি-ড: মীরাতুন নাহার সম্পাদিত, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা (৯ ডিসেম্বর ২০০১) পৃ. ৬১৪, ৬১৫

অথবা তাহারা পর্দানশীন নহেন বলিয়া কি আমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ উন্নত বলিয়াছি? আমি মানসিক দাসত্বের (enslaved মনের) আলোচনা করিয়াছি। কোনো একটা নূতন কাজ করিতে গেলে সমাজ প্রথমতঃ গোলযোগ উপস্থিত করে এবং পরে নূতন চালচলন সহিয়া লয়, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ পার্সী মহিলাদের পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বে তাঁহারা ছত্রব্যবহারেরও অধিকারিণী ছিলেন না, তারপর তাঁহাদের বাড়াবাড়িটা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, তবু ত পৃথিবী ধ্বংস হয় নাই। এখন পার্সী মহিলাদের পর্দামোচন হইয়াছে সত্য, কিন্ত মানসিক দাসত্ব মোচন হইয়াছে কি? অবশ্যই হয় নাই। আর ঐ যে পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের স্বকীয় বুদ্ধিবিবেচনার ত কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পার্সী পুরুষগণ কেবল অন্ধভাবে বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া স্ত্রীদিগকে পর্দার বাহিরে আনিয়াছেন। ইহাতে অবলাদের জীবনীশক্তির ত কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না—তাঁহারা যে জড়পদার্থ, সেই জড়পদার্থই আছেন। পুরুষ যখন তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে রাখিতেন, তাঁহারা তখন সেইখানে থাকিতেন। আবার পুরুষ যখন তাঁহাদের 'নাকের দড়ী' ধরিয়া টানিয়া তাঁহাদিগকে মাঠে বাহির করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা পর্দার বাহির হইয়াছেন! ইহাতে রমনীকুলের বাহাদুরী কি? ঐরূপ পর্দা-বিরোধ কখনই প্রশংসনীয় নহে।'

বেগম রোকেয়া একটা পৌরাণিক কাহিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ রামায়ণে বর্ণিত রাম-সীতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। সীতা সতী সাধ্বী স্ত্রী। শত গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তিনি পরিপূর্ণ মানবী হিসেবে ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে গৃহীত হননি। এই ঘটনা উল্লেখ করে রোকেয়া বলেন—

'পুরুষগণ স্ত্রীজাতির প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারি না। লোকে কালী, শীতলা প্রভৃতি রাক্ষস-প্রকৃতির দেবীকে ভয় করে, পূজা করে সত্য। কিন্ত সেইরূপ বাঘিনী, নাগিনী, সিংহী প্রভৃতি 'দেবী'ও কি ভয় ও পূজা লাভ করে না? তবেই দেখা যায় পূজাটা কে পাইতেছেন—রমণী কালী, না রাক্ষসী নৃমুণ্ডমালিনী? নারীকে শিক্ষা দেবার জন্য গুরুলোকে সীতা দেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন। সীতা অবশ্যই পর্দানশীন ছিলেন না। তিনি রামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গী, রাণী, প্রণয়িনী এবং সহচরী। আর রামচন্দ্র প্রেমিক, ধার্ম্মিক সবই। কিন্তু রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ পায় যে, একটি পুতুলের সঙ্গে কোন বালকের যে সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে প্রাণপণে ভালবাসিতে পারে; পুতুল হারাইলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলের ভাবনায় অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতে পারে; পুতুলটা যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, তাহার প্রতি

খড়্গহস্ত হইতে পারে; হারান পুতুল ফিরিয়া পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইতে পারে; আবার বিনা কারণে রাগ করিয়াও পুতুলটা কাদায় ফেলিয়া দিতে পারে,—কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না, কারণ হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ! বালক তাহার পুতুল স্বেচ্ছায় অনলে উৎসর্গ করিতে পারে, পুতুল পুড়িয়া গেল দেখিয়া ভূমে লুটাইয়া ধূলি-ধূসরিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারে!! রামচন্দ্র 'স্বামীত্বের' ষোলআনা পরিচয় দিয়াছেন!! আর সীতা?—কেবল প্রভু রামের সহিত বনযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে। রাম বেচারা অবোধ বালক, সীতার অনুভব শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই, কেন না, বুঝিয়া কার্য্য করিতে গেলে স্বামীত্বটা পূর্ণমাত্রায় খাটান যাইত না।'

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নারীদের স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাদের মন যে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি সে সম্পর্কে রোকেয়া বলেন—

'খ্রীষ্টিয়ান সমাজে যদিও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে, তবু রমণী আপন স্বত্ব ষোলআনা ভোগ করিতে পায় না। তাহাদের মন দাসত্ব হইতে মুক্তি পায় না। স্বামী ও স্ত্রী কতক পরিমাণে জীবনের পথে পাশাপাশি চলিয়া থাকেন বটে; কিন্তু প্রত্যেক উত্তমার্দ্ধই (Better half) তাঁহার অংশীর (Partner-এর) জীবনে আপন জীবন মিলাইয়া তন্ময়ী হইয়া যায় না। স্বামী যখন ঋণজালে জড়িত হইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া মরমে মরিতেছেন, স্ত্রী তখন একটা নূতন টুপী'র (Bonnet-র) চিন্তা করিতেছেন! কারণ, তাঁহাকে কেবল মূর্ত্তিমতী কবিতা হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—তাই তিনি মনোরমা কবিতা সাজিয়া থাকিতে চাহেন। ঋণদায়রূপ গদ্য (Prosaic) অবস্থা তিনি বুঝিতে অক্ষম।'

এরপর তিনি মুসলিম নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ তুলে বলেন—

'এখন মুসলমান সমাজে প্রবেশ করা যাউক। মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্যা। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা 'আড়াই জন' হই। আপনারা 'মুহম্মদীয় আইনে' দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোনো ধনবান মুসলমানের সম্পত্তির বিভাগ করা দেখেন, কিম্বা জমিদারী পরিদর্শন করিতে যান, তবে দেখিবেন কার্যতঃ কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে। আমি এখন অপার্থিব সম্পত্তির কথা বলিব। পিতার স্নেহ,

যত্ন ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি। এখানেও পক্ষপাতিত্বর মাত্রা বেশি। ঐ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষিতার অর্দ্ধেকই আমরা পাই কই? যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারিজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দুইজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি, এ, পর্যন্ত) পাশ করে, সেখানে কন্যা দেড়টা পাশ (এন্ট্রান্স পাশ ও এফ, এ, ফেল) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয়ের সংখ্যাই পাওয়া যায় না।'

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পিতা-মাতার সম্পত্তিতে সন্তানের সমঅধিকার এখন একটি জনপ্রিয় দাবি। ওই সময় রোকেয়া ভাই-বোনের মধ্যে সমতার দাবি তুলে ধরে 'অর্ধাঙ্গী'তে লিখেছিলেন—

'আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের 'অর্ধেক' নহি, তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত—পুত্র যেখানে দশ মাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস! পুত্রের জন্য যতখানি দুগ্ধ আমদানী হয়, কন্যার জন্য তাহার অর্দ্ধেক! সেরূপ ত নিয়ম নাই! আমরা জননীর স্নেহ মমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃহৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব, ঈশ্বর পক্ষপাতী? তিনি কি মাতা অপেক্ষা অধিক করুণাময় নহেন?

ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও ধর্মের মূল বিষয়বস্তু যা ভোগ-সুবিধার পক্ষে নয় তা বিসর্জন দিয়ে যা কিছু ভোগ-সুখের জন্য সুবিধাজনক সেগুলি ধর্মের চেয়েও বড় ধর্ম হয়ে উঠেছে। এরই একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে রোকেয়া 'রসনা পূজা' প্রবন্ধে লেখেন—

'বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু পূজা করিয়া থাকে। কেহ অগ্নি উপাসক, কেহ চন্দ্র-সূর্যের উপাসক, কেহ জড় পুত্তলিকা উপাসক ইত্যাদি। কেবল নিষ্ঠাবান মুসলমান অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বস্তুর উপাসনা করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ রসনা-পূজা করিয়া থাকেন। যদি আমি ইহাদিগকে 'রসনা-পরস্ত' (রসনার উপাসক) বলি, তবে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। ...স্ত্রীলোকেরা ঐ পূজার আয়োজনে সমস্ত সময় ব্যয় করেন। অন্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে তাহাদের অবসর থাকে না। সমস্ত দিন ও অর্ধরাত্র ত তাহাদের রন্ধনের চিন্তায়ই অতিবাহিত হয়, পরে নিদ্রায় স্বপ্ন দেখেন–'যাঃ! মোরব্বার সিরা (চিনির রস) জ্বলিয়া গেল!' ... আক্ষেপের বিষয়, রমজান মাসে আমাদের খাদ্য-সামগ্রীর ধুমধাম সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়। সমস্ত দিন সাংসারিক কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া নির্মল চিত্তে উপাসনা করা ত দূরে থাকুক, 'ইফতারী' (সন্ধ্যাকালীন খাবার) প্রস্তুত করিতেই দিন শেষ হয়। ...কবে মুসলমান 'মানুষ' হইবে? রসনা-পূজা ছাড়িয়া ঈশ্বর-পূজা করিতে শিখিবে?'

'শাসন কর এবং ভাগ কর'-এ সাম্প্রদায়িক নীতির একটা উৎকৃষ্ট প্রকাশ ইংরেজ রাজশক্তি ঘটাতে চেয়েছিল বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং পরবর্তীতে শরৎচন্দ্র-নজরুল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য কলম ধরেছিলেন। যেমন নজরুল লিখেছিলেন, 'হিন্দু না মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন', বা 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'। রবীন্দ্রনাথ দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম মিলনের আকুতি নিয়ে লেখেন—

> 'আজ আমাদের বিজয়া-সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। চিত্তকে প্রসারিত কর, ...শঙ্খ মুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্ত সূর্যের দিকে যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো...।'

রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বানের দুই মাস পরেই একই আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে রোকেয়ার কণ্ঠে। রোকেয়া মনে করেন, বিশেষ ধর্মের বিশেষ নিয়মবিধি পালনের বাইরে যখন তা একটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসবের পর্যায়ে যায় তখন তাকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখলে মনের বদ্ধতা দূর হয় না, আনন্দও মনের বিস্তার ঘটিয়ে আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে না। সেজন্য তিনি মুসলমানদের খুশি বা আনন্দের ঈদ উৎসবের দিন উল্লেখ করে 'ঈদ সম্মিলন' প্রবন্ধে বলেন—

> 'এমন শুভ দিনে আমরা আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দকে ভুলিয়া থাকি কেন? ঈদের দিন হিন্দু-ভ্রাতৃগণ আমাদের সহিত সম্মিলিত হইবেন, এরূপ আশা কি দুরাশা? সমুদয় বঙ্গবাসী একই বঙ্গের সন্তান নহেন কি? অন্ধকার অমানিশার অবসানে যেমন তরুণ অরুণ আইসে, তদ্রূপ আমাদের এখানে অভিশাপের পর এখন আশীর্ব্বাদ আসুক; ভ্রাতৃ-বিরোধের স্থানে এখন পবিত্র একতা বিদ্যমান থাকুক। আমীন!'

সঙ্গীত সম্পর্কে মুসলিম সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার প্রসঙ্গ তুলে তিনি মুসলমানদের পবিত্রগ্রন্থ কোরআন শরীফের প্রথম বাংলা অনুবাদক গিরিশচন্দ্র সেনের কথা উল্লেখ করে বলেন—

> 'মাননীয় বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুবাদিত অনেকগুলি পুস্তক আমার নিকট আছে। তাঁহার প্রেরিত 'ধর্ম্মসাধন নীতি' পাঠকালে আমার মনে হয়, তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক, না ইসলাম ধর্ম প্রচারক?'

এর পর গিরিশচন্দ্র সেন এর প্রসঙ্গ টেনে ধর্মসঙ্গীত নিয়ে তিনি বলেছেন—

> 'ধর্ম্মসঙ্গীত সম্বন্ধে দুই চারটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। যে সকল সঙ্গীতে লোকের চরিত্র কলুষিত হইতে পারে, তাহা গান বা শ্রবণ করা

শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। কিন্তু সাধকদিগের সাধনার প্রধান অনুকূল বলিয়া ধর্ম্মসঙ্গীত মোহম্মদীয় শাস্ত্রে সাধনের জন্য সমাদৃত হইয়াছে। এই কথা লিখিয়া আপনি আমাদিগকে 'সঙ্গীত-বিরোধী' দুর্নাম হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস সে 'মোসলমান ধর্ম্মটা বড় ''কট খট'' কারণ সঙ্গীত হেন মধুর বস্তুটি উহাতে নিষিদ্ধ।' এখন আর বোধ হয় কেহ আমাদিগকে সঙ্গীত-বিরোধী মনে করিবেন না। মোসলমান-শাস্ত্র সঙ্গীতকে সুনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া উহাকে অশ্লীলতা দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে। সঙ্গীত শ্রবণে লোকের মন কি বিচলিত (Distrubed) হয়? না, বরং উহাতে এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে যে, শ্রোতা একাগ্রচিত্ত হইয়া পড়ে। প্রায় সকল দেশেই শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য শিশুরঞ্জক সুমধুর ছড়া গীত হইয়া থাকে। ইউরোপে রোগীর নিদ্রাকর্ষণের নিমিত্ত সেবিকাগণ গান করিয়া থাকেন। দুইজন মান্য মোসলমান স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা সঙ্গীত শ্রবণকালে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে উপাসনা করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, একদা তিনি প্রাতঃকালীন নামাজের সময় গায়কদের ভৈরবী আলাপ শুনিতে শুনিতে যেমন একাগ্রমনে নামাজ পড়িতে পারিয়াছিলেন, সেরূপ আত্মহারা নামাজ জীবনে আর কখনও পড়েন নাই! তবে ঢাকের চড়চড়ি বা আনাড়ী গায়কের গর্দ্দভ-গর্জনের কথা ভিন্ন! তাহাতে ত জলস্থল কম্পিত হয়—আর মানুষের মন চঞ্চলা না হইবে কেন?'[৮১]

রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম

প্রকৃতির সাথে বাঁচার সংগ্রামে নিয়োজিত যুথবদ্ধ মানুষ একদিকে ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজনে ভাষার জন্ম দিয়েছে। এরপর বস্তুগত উৎপাদন যেমন ভাষার বিকাশ ঘটিয়েছে তেমনি ভাষাও উৎপাদনব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করেছে। সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে রোকেয়ার মনোভাবের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সাহিত্য সেবা 'শিল্পের জন্য শিল্প চর্চা' ছিল না। লেখনীর মধ্য দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে সেক্যুলার মানবতাবাদী আধুনিক গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার উন্মেষ ঘটিয়ে তার ভিত্তিতে নারীমুক্তির পথ প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। তাঁর লেখায় ছত্রে ছত্রে গভীর চিন্তার ছাপ যেমন রয়েছে তেমনি তাতে একটি সামাজিক উদ্দেশ্যমুখীনতা সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। তৎকালীন সময়ে নারীমুক্তি প্রসঙ্গে যত প্রশ্ন ছিল, চিন্তার যত বাধা ছিল, রোকেয়া তাঁর সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি বিষয়কে কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শানিত খোঁচায়, কখনও ক্ষুরধার যুক্তির আধারে, কখনও কল্পনার রূপকে, কখনওবা হৃদয়স্পর্শী কাহিনিতে তুলে এনেছেন।

৮১. রোকেয়া রচনাবলী, মুসলমান কন্যার পুস্তক সমালোচনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২০৮

রোকেয়ার পূর্বেও কয়েকজন মুসলিম নারী সাহিত্যিকের সন্ধান আমরা পাই। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রহিমুন্নেছা নামের একজন মুসলিম কবির কথা জানা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী, সাধন-কবি দেওয়ান হাছন রাজার সৎবোন ছহিফা বানু, খুলনা তেতুলিয়ার জমিদার মৌ. হামিদুল্লা খানের স্ত্রী আজিজুন্নেছা খাতুন, রোকেয়ার বড়বোন করিমুন্নেছা খানম প্রমুখের সাক্ষাৎ মেলে। রোকেয়ার জন্মের ৩২ বছর আগে নওয়াব ফয়জুন্নেছা ও ৩০ বছর আগে ছহিফা বানু জন্মেছিলেন। আজিজুন্নেছা ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। ফয়জুন্নেছার *'রূপজালাল'*, ছহিফা বানুর *'ছহিফা সঙ্গীত' 'ইয়াদগারে ছহিফা' 'ছহিবানের জারী'*, আজিজুন্নেছার অনুবাদ-কাব্য 'হারমিট' ইত্যাদির মধ্যে সাহিত্যভূবনে সাহসী পদচারণা পরিলক্ষিত হলেও তা একটা ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেনি। রোকেয়া এক্ষেত্রে এতটাই ব্যতিক্রম যে নারী সাহিত্যিকরাই শুধু নয় তার সমসাময়িক মুসলিম পুরুষ সাহিত্যিকদের চেয়েও তিনি অনেকদূর ও বহু মাত্রায় এগিয়ে ছিলেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ রোকেয়ার সাহিত্য মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

> '...জীবিত ও মৃত বুড়োদের মধ্যে সত্যিকার মুসলমান সাহিত্যিক সংখ্যায় অতি অল্প—মীর মোশাররফ হোসেন, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন, কায়কোবাদ, কাজী ইমদাদুল হক ও মিসেস আর এস হোসেন। এঁদের মধ্যে কাল মিসেস আর এস হোসেনকে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দেবে। শুধু মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে নয়, গোটা বাংলাতে নারী সাহিত্যিকদের মধ্যে মিসেস আর এস হোসেনের স্থান অতি উচ্চে—সর্বোচ্চ কিনা তা এখন পুরোপুরি বলতে পারছি না। কিন্তু সময় সময় তাই মনে হয়।'[৮২]

বহুমুখী চিন্তার খোরাক যুগিয়ে কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে রোকেয়া লিখে গেছেন। বহু আরবি-ফারসি শব্দের সাথে অর্থব্যঞ্জনা পূর্ণ নতুন শব্দাবলি তিনি ব্যবহার করেছেন। উর্দু, ফারসি ও ইংরেজি সাহিত্য থেকে বহু উদ্ধৃতি তিনি যথাস্থানে প্রয়োগ করেছেন। আলাপচারিতা ও কথোপকথনের বিশেষভঙ্গি তাঁর রচনাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচনসহ টিকা-টিপ্পনি সংযোজন করে আধুনিক যুক্তিসঙ্গত বিষয়সমূহকে হাস্য-কৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, শ্লেষ ও কটাক্ষের পরিমিত প্রয়োগে তিনি এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যা একদিকে সুষমামণ্ডিত অন্যদিকে হৃদয়গ্রাহী ও আবেদনময়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্যিকদের রচনার নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি রয়েছে রোকেয়ার রচনায়। ৩০ বছরের সাহিত্যকর্ম বিপুলতার দিক থেকে তেমন না হলেও গুণে ও বৈচিত্র্যে তা ভরপুর। তাঁর গ্রন্থগুলি

৮২. রোকেয়া রচনাসংগ্রহ-ডঃ মীরাতুন নাহার, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা (৯ ডিসেম্বর ২০০১) পৃ. ৬২৭

হল '*মতিচূর*' (১ম ও ২য় খণ্ড), *Sultana's Dream (সুলতানার স্বপ্ন), পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী*। এছাড়া তাঁর বেশ কিছু কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা ইত্যাদি রয়েছে। তাঁর 'ভ্রাতা-ভগ্নি', 'তিনকুঁড়ে', 'পরী-ঢিবি', 'বলিগর্ত্ত', 'পঁয়ত্রিশ মণ খানা', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রভৃতি ব্যঙ্গধর্মী রচনা রয়েছে। প্রবন্ধের মধ্যে 'নিরীহ বাঙ্গালী', 'ঈদ সম্মিলন', 'সিসেম ফাঁক', 'চাষার দুক্ষু', 'এণ্ডি শিল্প', 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি', 'লুকানো রতন', 'রানী ভিখারিনী', 'উন্নতির পথে', 'সুবেহ সাদেক', 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রোকেয়ার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া ছিল না। তা সত্ত্বেও অসাধ্য সাধন প্রয়াসে নিজেকে নির্মাণ করে গেছেন বিস্ময়কর এক শৈল্পিক সত্ত্বায়।

রোকেয়ার সাহিত্যসৃষ্টি অনুকরণ করে গড়ে ওঠেনি। সবটাই ছিল জীবন-জিজ্ঞাসা থেকে তৈরি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁর নিজস্ব Style-এর ভিতর থেকেই ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্য সৌধ এবং দক্ষ কারুকাজ। কিন্তু *মতিচূর (১ম খণ্ড) প্রকাশের পর 'বাসনা', 'বন্দর', 'কহিনূর', 'সঞ্চয়', 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা'* ইত্যাদিতে অনেকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন '*মতিচূর*' গ্রন্থের ভাব ও ভাষা খ্যাতিমান লেখকদের গ্রন্থ থেকে কিংবা তাদের ভাব থেকে গৃহীত হয়েছে। কিছু নামও উল্লেখ করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে '*মতিচূর*' গ্রন্থের নিবেদনে রোকেয়া বলেন—

> 'মতিচূরের কোন কোন পাঠকের সমালোচনায় জানা যায় যে তাহারা মনে করেন, মতিচূরের ভাব ও ভাষা খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হতে গৃহীত হইয়াছে। পূর্ববর্তী কোন কোন পুস্তকের সহিত মতিচূরের সাদৃশ্য দর্শনে পাঠকদের ওরূপ প্রতীতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়, অপরের ভাব কিংবা ভাষা আয়ত্ত করিতে যে সাহস ও নিপুণতার প্রয়োজন, তাহা আমার নাই; সুতরাং তাদৃশ চেষ্টা আমার পক্ষে অসম্ভব। (কালীপ্রসন্নবাবুর '*ভ্রান্তিবিনোদন*' আমি অদ্যপি দেখি নাই এবং বঙ্কিমবাবুর সমুদয় গ্রন্থ পাঠের সুযোগও প্রাপ্ত হই নাই। যদি অপর কোন গ্রন্থের সহিত মতিচূরের সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ দৈব ঘটনা।)'

বাংলাভাষায় আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সামন্তীয়সমাজের নর-নারী সম্পর্কিত প্রথাগত জীবনধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের সূচনা না করলেও প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্কে আধুনিক ধারণা নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নর-নারীর মিলিত জীবনের মাঝে ঐক্য-সমঝোতা সৃষ্টি ও বুর্জোয়া মানবতাবাদী আবেগের দাবি তুলে ধরতে চেয়েছেন ধর্মীয় সংস্কারের প্রথাকে আঘাত কিংবা চূর্ণবিচূর্ণ না করেই। তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের '*কৃষ্ণকান্তের উইল*' কিংবা '*বিষবৃক্ষ*' প্রকাশিত হওয়ার পরে অনেক পুরুষের মাঝে প্রতিক্রিয়া

দেখা গিয়েছিল। বঙ্কিম-সাহিত্য পড়ে 'স্ত্রীগণ স্বামী সেবায় উদাসীন হবেন এবং বশ্যতা শিথিল হয়ে কলহের বাতাস ভারী হয়ে উঠতে পারে' এ আশঙ্কায় তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। রোকেয়া এসব প্রতিক্রিয়ার সাথে হয়তো পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচনা সম্পর্কেও অনুরূপ অভিযোগ উঠেছিল। তিনি বলেন—

> 'অনেকে হয়তো ভয় পাইয়াছেন যে, বোধ হয় একটা পত্নী বিদ্রোহের আয়োজন করা হইতেছে। অথবা ললনাগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষকে রাজকীয় কার্য্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেই পদগুলি অধিকার করিবেন—শামলা, চোগা, আইন-কানুনের পাঁজি-পুথি লুঠিয়া লইবেন। অথবা সদলবলে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কৃষককে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের শস্যক্ষেত্র দখল করিবেন, হাল গরু কাড়িয়া লইবেন, তবে তাহাদের অভয় দিয়া বলিতে হইবে—নিশ্চিন্ত থাকুন।[৮৩]

রবীন্দ্রনাথের '*চোখের বালি*' উপন্যাস নিয়েও সমাজে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। রোকেয়ার সময়ে শরৎচন্দ্র-নজরুলের সাহিত্য নিয়ে গোঁড়া হিন্দু-মুসলমান সমাজে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা অনেকেই জানেন।

১৯০৫ সালে *নবনূর* সাহিত্য পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনা বিভাগে *মতিচূর* (১ম খণ্ড) সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল—

> '...*মতিচূরের* প্রবন্ধগুলি যখন প্রথমে *নবনূরে* প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠে আমাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল। ...এই উত্তেজনার ভাব কথঞ্চিত প্রশমিত হইলে পর গ্রন্থখানি ...সম্বন্ধে হৃদয়ে একটু অনুকূল ধারণা জন্মে। ...লেখিকা তাঁহার বক্তব্য ভালো করিয়াই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। ...একটি দোষের কথা এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজ সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজ-দেহে ক্ষত হইতে পারে, কিন্তু তদ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয়না। *মতিচূর* রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইয়াছেন, ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে এমত আশা করিতে পারি না।'[৮৪]

এ সমালোচনা প্রসঙ্গে রোকেয়া বলেন—

> '...ভ্রাতা ভগ্নীগণ হয়তো মনে করিবেন যে, আমি কেবল ভ্রাতৃবৃন্দকে নরাকার পিচাশরূপে অঙ্কিত করিবার জন্যই কলম ধরিয়াছি, তাহা নয়। আমি কোথাও ভ্রাতাদের প্রতি কটুশব্দ ব্যবহার করি নাই। কাহাকেও পাপিষ্ঠ,

৮৩. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, অর্দ্ধাঙ্গী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৩২
৮৪. বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য-মোতাহার হোসেন সূফী, সুর্বণ, ঢাকা (এপ্রিল ২০০১) পৃ. ৭৮

পিচাশ, নিষ্ঠুর বলিয়াছি কি? কেবল রমনী হৃদয়ের ক্ষত দেখাইয়াছি। ঐ যে কথায় বলে, 'বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়'; এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে ভগ্নীর দুঃখ বর্ণনা করিতে ভ্রাতানিন্দা হইয়া পড়িয়াছে।'[৮৫]

আবার ভিন্ন ধর্মী সমালোচনাও ছিল। *মতিচূর (১ম খণ্ড)* সম্পর্কে *'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়'* গ্রন্থ সমালোচনায় লেখা হয়েছিল—

'আমাদের দুর্গতির আরম্ভ যে কোথায়, তাহাই লেখিকা তাঁহার প্রাঞ্জল সুরুচিসদ্ভাবপূর্ণ, দৃষ্টান্তবহুল সরল অকপট মাধুর্যময় রচনা দ্বারা দেখাইতে যাইয়া স্বীয় বেদনার অনুভূতিকে ছত্রে ছত্রে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। লেখিকা বঙ্গীয় মুসলিম নারী সমাজের আদর্শ। ...পুস্তকখানি নারীকে তাহার ক্ষতস্থান চোখে অঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে, ...মার্জিত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্নেহ মমতা ও ভালবাসা কাহাকে বলে তাহা শিখাইয়া দিবে।'[৮৬]

মিসেস এম রহমান '*মতিচূর*' পাঠ করে কবিতায় ব্যক্ত করেন—

'মতিচূর' তুমি জানিলে কেমনে
নারীর প্রাণের জ্বালা? কোন শক্তি বলে
প্রবেশ করেছ তুমি বঙ্গ ললনার
হৃদয়ের মাঝে, যেথা শুধুই বেদনা
...গঠন করিতে হবে নূতন ভারত
মুক্ত হয়ে নারী আজি বাঁচাবে জগৎ...।[৮৭]

রোকেয়া কিছু কবিতা লিখেছেন। এসব কবিতায় নৈসর্গিক সৌন্দর্য বর্ণনা, মানবমনে স্নেহ-মমতা-ভালবাসার নানারূপ অভিব্যক্তি, দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা, শ্লেষ-বিদ্রূপ, প্রেম-বিরহ, আনন্দ-বেদনায় মানুষে মানুষে সম্পর্ক-সম্বন্ধের দ্বন্দ্ব, প্রকৃতির মাঝে মানব মনের বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশসহ নানা বিষয়ের রূপকে উপমা ও বর্ণনার ছটায় অলংকৃত করেছেন। তাঁর প্রথম কবিতা 'বাসিফুল'-এ পিসিমা (ফুফু) এবং শিশু ভাইপো (ভাতিজা)'র মাঝে অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা ও ভাইপোর অকাল প্রয়াণের বেদনার্ত স্মৃতি পাঠকের মনকেও দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলে। বাসিফুল হল ভাইপোর রূপক। কবিতায় আছে,

'পিসিমা! তোমার তরে আনিয়াছি ফুল,
...চেয়ে' দেখি, আনিয়াছে দু'টি বাসিফুল।

৮৫. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, গৃহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৫৩
৮৬. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৮, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৬১৭
৮৭. সৈয়দ নওশর আলী সম্পাদিত 'সহচর', আষাঢ়, ১৩২৯, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৬২৫

পিসিমা! তোমারি তরে এনেছি এ ফুল।
সেই কথা পুনরায় শুনিতে পরান চায়,—
কোথা সে বালক মোর প্রেমের পারুল?
...পাব না প্রাণের ধন, পাব না সে ফুল।
আর শুনিবে না প্রাণ সে ললিত কণ্ঠতান
প্রেমের পীযূষ-ভরা রাগিণী মঞ্জুল, ...।'

'শশধর' কবিতায় নীলাকাশে উদ্ভাসিত চাঁদের মাঝে নিজের মনের কল্পিত ভাবনাকে কাব্যকথায় এমনভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন যা জ্যোৎস্নার আলোকের প্রাণহরা আবেশের মাঝে চাঁদের কলঙ্ক সৌন্দর্য ও তার দুঃখভরা মুখ মনকে আবিষ্ট করে তোলে। 'নলিনী ও কুমুদ' কবিতার মধ্য দিয়ে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখী' কবিতার মতো করে প্রকৃতি ও সমাজ পরিবেশে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছেন সুন্দর বিন্যাসে। নলিনী পদ্মফুল আর কুমুদ শালুক ফুল। নলিনী বলে—

'দুর্বল হৃদয় পারে না বহিতে দারুণ যন্ত্রণা হেন;
জীবন সর্বস্ব হারায়েছি যদি, পরাণ যায় না কেন?
শরীর-পিঞ্জরে এ প্রাণ বিহগ থাকিতে চাহে না আর,
এস মৃত্যু। ত্বরা কর বিদূরিত দুঃসহ জীবন-ভার'
কুমুদ বলে, 'এই দেখ সখি! এখন ত আছে তেমনি উৎফুল্ল ধরা;
তবু কেন তুমি ভাব মন-দুঃখে; প্রকৃতি বিষাদে ভরা?
নলিনী বলে, '...এ জগতে আর থাকিতে বাসনা নাই।
জাগিয়া সহিয়া অশেষ যাতনা এখন ঘুমাতে চাই।
কুমুদ বলে, 'আহা! সখি, তুমি পূর্ণিমা-নিশির শোভা দেখে হ'তে সুখী
পারিলে না, তাই এ সুখ জগতে তুমি অপ্রসন্ন-মুখী।'

'স্বার্থপরতা' কবিতায় তিনি স্বার্থ এবং সুখানুভূতিকে কেন্দ্র করে একটি ভিন্নমাত্রিক চেতনা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, জীবনবোধ এবং রুচিবোধ যার যেমন সুখ-দুঃখবোধও তার তেমনি। আর স্বার্থহীন থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে অপরের স্বার্থ, দশের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ভাবা যেমন একটা স্বার্থপরতা আবার দশের স্বার্থ বলি দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থসর্বস্বতাও একটা স্বার্থপরতা। এটা নির্ভর করে একজন ব্যক্তির জীবন উদ্দেশ্যের দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি-সংস্কৃতি ও সংগ্রামের ধরনের ওপর। রোকেয়া বলছেন—

'...দস্যু অপরের সর্বস্ব লুটিয়া
যথা পুলকিত হবে
দানবীর তথা সর্বস্ব বিলায়ে

পরম আনন্দ লভে।
শুধু বল, রুচি যেমন যাহার
তার সুখ সেই মত।'

পরাধীনতার কবলে পতিত মাতৃভূমির করুণ দশা এবং তার প্রতি প্রাণের টানের অনুভবে 'প্রবাসী রবিণ ও তার জন্মভূমি' কবিতায় কবি বলেন—

'... জননী! করুণ স্বরে কেন ডাক আর
অনুরাগে, নিজ পানে চাহ একবার?
...কি বলিব পোড়া মুখে, বলি কিন্তু বড় দুঃখে
চাহিতে তোমার পানে পারি না যে আর।
এখন হয়েছ তুমি তস্করের লীলাভূমি
আমাদের বাসযোগ্য নহ তুমি আর
...কেন মা! করুণ স্বরে ডাকিলে আবার?'

বেগম রোকেয়া যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সেটি পর্দা প্রথায় অবরুদ্ধ মুসলিম নারী সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রতিকূল সময় ছিল। রোকেয়া 'বোরকা' প্রবন্ধে অনেক প্রশ্ন তুলে ধরে ধারণাগত পরিচ্ছন্নতা আনার চেষ্টা করেছেন। আদিমকালের উলঙ্গ মানবেরা বস্তুগত এবং ভাবগত উৎপাদনের পথে সভ্যতার ধাপে ধাপে জৈবিকসত্তা থেকে সাংস্কৃতিক সত্তায় তাদের উত্তরণ ঘটিয়েছে। এরই ফলস্বরূপ গান, নাচ, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি এসেছে। মানুষ তার শরীরের যে অংশ দিয়ে উৎপাদনী হাল-হাতিয়ারের যথাবিহিত কার্য পরিচালনা করে এবং উৎপাদন সম্পর্কের অংশ হিসেবে সামাজিক আদান-প্রদান, মনোভাব-মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটায় সেটুকু উন্মুক্ত থাকে। এককথায় সৃজনশীল ব্যবহারোপযোগী শারীরিক অংশের প্রকাশ আর নান্দনিক সৃজনশীলতার বাইরের অংশ ঢেকে রাখা আব্রু বা পর্দার অংশ। কায়িক ও মানসিক শ্রমের সঙ্গে গ্রথিত উত্তোরোত্তর বিকশিত পরিমিত ভূষণ মানবজীবনের একটা পরিশীলিত মূর্তিকে উপস্থিত করে। আবার এই আব্রুর প্রকাশও স্থান-কাল-প্রেক্ষিত ও উদ্দেশ্যমুখীনতায় সুন্দর-অসুন্দর, আব্রু-বেআব্রু রূপ ধারণ করে। যেমন শরীরচর্চা, সাঁতার প্রতিযোগিতা, খেলাধুলার সময় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে খেলোয়াড়েরা যে সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে তাকে শারীরিকভাবে নগ্ন-অর্ধনগ্ন মনে হলেও তা বাস্তবে কাপড়ের পোশাকের চেয়ে অনেক বেশি শিল্পের পোশাকে আবৃত থাকে। বোরকা পরে জিমনাস্টিক কলাকৌশল প্রদর্শন করতে গেলে তা যেমন কুরুচিপূর্ণ ঠেকবে, তেমনি শরীরচর্চার পোশাক পরে রাস্তায় চলাফেরা করলে তাও কদর্য দেখাবে। যেজন্য রোকেয়া বলেছেন—

'যাহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সন্মুখে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভালমতে পোষাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হন, তাহাদের পর্দা বেশী রক্ষা পায়। বর্তমান যুগে ইউরোপীয়া ভগ্নীগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন; তাঁহাদের পর্দা নাই কে বলে? তাঁহাদের শয়নকক্ষে, এমনকি বসিবার ঘরেও কেহ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেন না। এ প্রথা কি দোষণীয়? অবশ্য নহে। কিন্তু এদেশের যে ভগ্নীরা বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাঁহাদের না আছে ইউরোপীয়ানদের মত শয়নকক্ষের স্বাতন্ত্র (Bedroom privacy) না আছে আমাদের মত বোরকা। ...ইংরেজী আদব কায়দা (etiquette) ও আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে ভদ্রমহিলাগণ আড়ম্বররহিত (simple) পোষাক ব্যবহার করিবেন—বিশেষতঃ পদব্রজে ভ্রমণকালে চাকচিক্যময় বা জাঁকজমক বিশিষ্ট কিছু ব্যবহার করা তাঁহাদের উচিত নহে।'[৮৮]

শিক্ষার মাধ্যমে ভেতরের সংস্কৃতির পরিবর্তন আনতে না পারলে শুধু বাইরের আচরণে মানুষ সংস্কৃতবান হয় না। তিনি বলেছেন—

'পর্দা সম্বন্ধে আমি নিজের কোনো মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নই—কেবল এইটুকু বলি যে শেখ সাহেব (শেখ আবদুল্লাহ) পর্দাকে 'সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত' বলিয়াছেন, আমি তাহা মনে করি না। যন্ত্রণাদায়ক হইলে অবলাগণ 'বাবারে! মারে! মলুম রে! গেলুম রে!' বলিয়া আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেন।'[৮৯]

আসলে তিনি আচরণের চেয়ে চেতনা ও রুচির ওপর জোর দিয়েছেন। লেখনীর মাধ্যমে নারীকে চিন্তা ও কর্মে আধুনিক ও যুক্তিবাদী হবার আহ্বান করে গেছেন। তিনি লিখেন—

'সভ্যতা (civilization)—ই জগতে পর্দা বৃদ্ধি করিতেছে! যেমন পূর্ব্বে লোকে চিঠিপত্র কেবল ভাঁজ করিয়া পাঠাইত, এখন সভ্য (civilized) লোকে চিঠির উপর লেফাফার আবরণ দেন। চাষারা ভাতের থালা ঢাকেনা; অপেক্ষাকৃত সভ্য লোকে খাদ্য সামগ্রীর তিন চারি পাত্র একখানা বড় থালায় (tray-তে) রাখিয়া উপরে একটা 'খানপোষ' বা 'সরপোষ' ঢাকা দেন; ... এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন টেবিলের আবরণ, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি। ...তবে সকল নিয়মেরই একটা সীমা আছে। এদেশে আমাদের অবরোধ প্রথাটা বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। ... পুরুষেরা যেমন সকল শ্রেণীর লোকের সহিত

৮৮. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, বোরকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৪২
৮৯. রোকেয়া রচনাবলী, বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি (সভানেত্রীর অভিভাষণ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২২৯

আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদের তদ্রূপ করা উচিত। অবশ্য যাঁহাদিগকে আমরা ভদ্র-শিষ্ট বলিয়া জানি, কেবল তাহাদের সঙ্গে মিশিব, তাহারা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বিনী (ইহুদী, নাসারা, বুৎপরস্ত বা যাই) হউন, ক্ষতি নাই। ... আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ কি?'[৯০]

'হজ্বের সময় নরনারীর তুল্য অধিকার। উভয়ের পরিধেয় একইপ্রকার সেলাইবিহীন দুই খণ্ড বস্ত্র মাত্র। এখানে জরীর লেস্ ঢাকা নূতন ফ্যাসানের বোরকা নাই, ঘেরা-টোপ ঢাকা পাল্কীও নাই। শরীফজাদী বিবিদিগকে পদব্রজেই সাফা এবং মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপত্যকায় দৌড়াইতে হইবে; কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। এ সময় পুরুষদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি ও ঠেলাঠেলি অনিবার্য্য। ভারতীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা হজ্বের জন্য আলাদা 'পর্দ্দানশীন' দিবস প্রচলন করেন না কেন?'[৯১]

রোকেয়া তাঁর লেখার সর্বত্রই বাস্তবতার ছাপ, জাগরণের ডাক, বিবেকের তীব্র কষাঘাতে ঘুরে দাঁড়াবার ও পরিবর্তন প্রয়াস সৃষ্টির এমন একটা তাগিদ রেখেছেন যাকে অস্বীকার করা চলে না। 'গৃহ' প্রবন্ধে রোকেয়া বলছেন—

'আবাস বিশ্লেষণ করিলে দুই অংশ দেখা যায়—এক অংশ আশ্রয়স্থান, অপরাংশ পারিবারিক জীবন (অর্থাৎ Home)। গৃহ রচনা স্বাভাবিক; বিহগ বিহগী পরস্পরে মিলিয়া নীড় নির্ম্মাণ করে, শৃগালেরও বাসযোগ্য গর্ত্ত প্রস্তুত হয়। ঐ নিলয় ও গর্ত্তকে আলয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা প্রকৃত 'গৃহ' নয়। ...কেবল চারি প্রাচীরের ভিতর থাকিলেই গৃহে থাকা হয়না। এদেশে বাসর ঘরকে 'কোহ্বর' বলে, কিন্তু 'কবর' বলা উচিত!! বাড়ীখানা ত শরাফতের, সেখানে যেমন একপাল ছাগল আছে, হংস, কুক্কুট আছে, সেইরূপ একদল স্ত্রীলোকও আছেন। অথবা স্ত্রীলোকদের 'বন্দিনী' বলা যাইতে পারে। ...'এত বড় সংসারে আমরা নিরাশ্রয়' বলিয়া আমি ভুল করি নাই ...আমরা যে কোন অবস্থায় থাকিনা কেন, অভিভাবকের বাটিতে থাকি। ...যখন আমাদের চালের উপর খড় থাকে না, দরিদ্রের জীর্ণতম কুটীরের শেষ চালখানা ঝঞ্ঝানিলে উড়িয়া যায়—টুপ-টাপ বৃষ্টি ধারায় আমরা সমস্ত রাত্রি ভিজিতে থাকি—চপলা-চমকে নয়নে ধাঁধা লাগে—বজ্রনাদে মেদিনী কাঁপে, এবং আমাদের বুক কাঁপে, প্রতি মূহুর্ত্তে ভাবি, বুঝি বজ্রপাতে মারা যাই—তখনও আমরা অভিভাবকের বাটিতেই থাকি। যখন আমরা রাজকন্যা, রাজবধূরূপে প্রাসাদে থাকি, তখনও প্রভুগৃহে থাকি। আবার যখন ঐ প্রাসাদতুল্য ত্রিতল অট্টালিকা ভূমিকম্পে চূর্ণ হয়—সোপান অতিক্রম করিয়া অবতরণকালে আমাদের মাথা ভাঙ্গে, হাত-পা ভাঙ্গে রক্তাক্ত কলেবরে হতজ্ঞান প্রায় অবস্থায় গোশালায় গিয়া আশ্রয়

৯০. রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর : প্রথম খণ্ড, বোরকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৪৩, ৪৪
৯১. রোকেয়া রচনাবলী, হজ্বের ময়দানে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ২৫২

লই,—তখনও অভিবাবকের বাটিতে থাকি!! অথবা গৃহস্থের বৌ রূপে প্রকাণ্ড আটচালায় বাস করিলেও প্রভুর আলয়ে থাকি; আর যখন চৈত্রমাসে ঘোর অমানিশীথে প্রভুর বাটিতে দুষ্টলোক কর্ত্তৃক লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় হয়, সব জিনিসপত্রসহ ঘরগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে,—আমরা একবসনে প্রাণটি হাতে করিয়া কোনমতে দৌড়াইয়া গিয়া দূরস্থিত একটা কুলগাছ তলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকি—তখনও অভিভাবকের বাটিতে থাকি!!! (জানিনা, কবরের ভিতরও অভিবাবকের বাটিতে থাকা হয় কিনা!!) ... তাই বলি গৃহ বলিতে আমাদেরই একটি পর্ণকুটীর নাই। প্রাণী জগতে কোন জন্তুই আমাদের মত নিরাশ্রয়া নহে। সকলের গৃহ আছে—নাই কেবল আমাদের।'

আবার যখন তিনি 'সুগৃহিণী' লেখেন তখন মনে হতে পারে যাদের গৃহ বলে কিছু নেই তারা আবার সুগৃহিণী হবে কীভাবে? রোকেয়া বলেন—

'ইতঃপূর্ব্বে আমি 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে আমাদের প্রকৃত অবস্থার চিত্র দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি কিন্তু সত্য কথা সর্ব্বদাই কিঞ্চিৎ শ্রুতিকটু বলিয়া অনেকে উহা পছন্দ করেন নাই। অতঃপর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, নারী ও নর উভয়ে একই বস্তুর অঙ্গবিশেষ। যেমন একজনের দুইটি হাত কিংবা কোন শকটের দুইটি চক্র, সুতরাং উভয়ে সমতুল্য, অথবা উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। একচক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লোকে কানা বলে। যাহা হউক আধ্যাত্মিক সমকক্ষতার ভাষা যদি স্ত্রীলোকেরা না বুঝেন, তবে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চভাবের কথায় কাজ নাই। আজি আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? বোধ হয় আপনারা সমস্বরে বলিবেন, 'সুগৃহিণী হওয়া'।'

তারপর তিনি বিশদ বিস্তারিতভাবে গৃহকর্মের অর্থাৎ রান্না, গৃহসজ্জা, গৃহ পরিবেশ, গৃহবিন্যাস, গৃহসামগ্রী, আর্থিক সামর্থ্য বিচারে চলা, সূচিকর্ম, পরিজনের যত্ন, সন্তান পালন, পশুপালন রীতি, উদ্যান প্রস্তুত প্রণালী (Horticulture), রোগীর সেবা, প্রতিবেশীদের সাথে ব্যবহার ইত্যাদি মিলে যা কিছু সুচারুরূপে করলে সুগৃহিণী হওয়া যায় সে সম্পর্কে বলেন—

'কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আপনাদের অনেকেই প্রকৃত সুগৃহিণী হইতে পারেন নাই। কারণ আমাদের বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা আমরা লাভ করিতে পারি না। সমাজ আমাদের উচ্চশিক্ষা লাভ করা অনাবশ্যক মনে করেন। পুরুষ বিদ্যালাভ করেন অন্ন উপার্জ্জনের আশায়, আমরা বিদ্যালাভ করিব কিসের আশায়? অনেকের মতে আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমাদিগকে অন্ন চিন্তা করিতে হয় না, সম্পত্তি রক্ষার্থে মোকদ্দমা

করিতে হয় না, চাকরীলাভের জন্য সার্টিফিকেট ভিক্ষা করিতে হয় না, 'নবাব' 'রাজা' উপাধিলাভের জন্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খোসামোদ করিতে হয় না, কিংবা কোন সময়ে দেশরক্ষার্থে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে না। তবে আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ (অথবা Mental culture) করিব কিসের জন্য? আমি বলি, সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা (Mental culture) আবশ্যক।'

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সুরুচি ও উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধ আয়ত্ত্ব করা ছাড়া গৃহকর্মকেও সুচারুভাবে পরিচালনা করা যায় না। রোকেয়া গৃহকর্মের বিশদ বিবরণ তুলে ধরে গভীর পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ সহকারে গৃহে যে কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা বাস্তাবিকই যে কোন মানুষকে ভাবিয়ে তুলবে। তিনি বলেন—

'গৃহখানা পরিষ্কার ও অল্পব্যয়ে সুন্দর রূপে সাজাইয়া রাখিতে হইলে বুদ্ধির দরকার। ...গৃহিণীকে স্বীয় সলিকা (taste) দেখাইতে হইবে। ...গৃহ সামগ্রী ...সাজাইয়া গুছাইয়া রাখার জন্যও সলিকা চাই। একটা মেয়েলি প্রবাদ আছে, 'সেই ধান সেই চাউল গিন্নীগুণে আউল ঝাউল' (এলোমেলো) ...অনেক শ্রীমতি পান সাজিতে বসিয়া যাঁতির খোজ করেন; যাঁতি পাওয়া গেলে দেখেন পানগুলি ধোওয়া হয় নাই। ...কেহবা চা'র পাত্র (Tea pot) মৎসাধাররূপে ব্যবহার করেন, ...পিতলের বাটিতে তেঁতুলের আচার থাকে। ইত্যাদি।'

পরিবারের জন্য আর্থিক শৃঙ্খলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে প্রসঙ্গে রোকেয়া বলেন—

'পরিমিত ব্যয় করা গৃহিণীর একটা প্রধান গুণ। হতভাগা পুরুষেরা টাকা উপার্জ্জন করিতে কিরূপ শ্রম ও যত্ন করেন, কতখানি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এক একটী পয়সার মূল্য (পারিশ্রমিক) দিয়া থাকেন, অনেক গৃহিণী তাহা একটু চিন্তা করিয়াও দেখেন না। উপার্জ্জন না করিলে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিবেন, যথাসাধ্য কটুকাটব্য বলিবেন, কিন্তু একটু সহানুভূতি করেন কই? ...সুশিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে আমরা টাকার সদ্ব্যবহার শিখিব কিরূপে? গৃহিণীরা যে স্বামীকে ভালবাসেন না, আমি ইহা বলিতেছি না। ...বাস্তবিক স্ত্রীদের অন্ধপ্রেমে অনেক সময় পুরুষদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট সাধিত হয়। ...কেহ আবার পরিমিত ব্যয় করিতে যাইয়া একেবারে কৃপণ হইয়া পড়েন, ইহাও উচিত নহে। ...গৃহিণী যে খাদ্য প্রস্তুত করেন, তাহার উপর পরিবারস্থ সকলের জীবন ধারণ নির্ভর করে। মূর্খ রাঁধুনীরা প্রায়ই 'কালাই' রহিত তাম্রপাত্রে দধি মিশ্রিত করিয়া যে কোর্ম্মা প্রস্তুত করে, তাহা বিষ ভিন্ন আর কিছু নহে; ...সুতরাং রন্ধন প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর ডাক্তারি ও (Chemistry) রসায়ন বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান

আবশ্যক। ...অনেকে শাক সবজী খাইতে ভালবাসেন। বাজারের তরকারি অপেক্ষা সহজাত তরকারি অবশ্য ভাল হয়। ...যদি তাঁহারা উদ্যান প্রস্তুত প্রণালী (Horticulture) অবগত থাকেন, ...অন্ততঃ কোন্ স্থানের মাটি কিরূপ, কোথায় শশা ভাল ফলিবে কোথায় লঙ্কা ভাল হইবে, গৃহিণীর এ জ্ঞানটুকু ত থাকা চাই। অনেকেই ছাগল, কুক্কুট, হংস, পারাবত ইত্যাদি পালন করেন, কিন্তু সকল জন্তু পালন করিবার রীতি অনেকেই জানেন না। ...তবেই দেখা যায়, এক রন্ধন শিক্ষা করিতে যাইয়া আমাদিগকে উদ্ভিদ বিজ্ঞান, রসায়ন ও উত্তাপ তত্ত্ব (Horticulture, Chemistry & Theory of heat) শিখিতে হয়!! অন্নের পরেই বস্ত্র, ...শীত-গ্রীষ্মানুযায়ী বস্ত্র প্রস্তুত কিংবা সেলাই করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। ...এ জন্যও সুশিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। ...পরিবারভুক্ত লোকদের সেবা যত্ন করা ... প্রত্যেকের সুখ সুবিধার নিমিত্ত নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ করা রমনী জীবনের ধর্ম। এ কার্য্যের জন্যও প্রশিক্ষণ (training) চাই। সচরাচর গৃহিণীরা পরিজনকে সুখ দিবেন ত দূরের কথা, তাঁহাদের সহিত ছোট ছোট বিষয় লইয়া কোঁদল কলহে সময় কাটাইয়া থাকেন। শাশুড়ীর নিন্দা ননদিনীর নিকট, আবার ননদের কুৎসা মাতার নিকট করেন, এইভাবে দিন যায়। ...কেহ পীড়িত হইলে তাহার যথোচিত সেবা করা গৃহিণীর কর্তব্য, রোগীর সেবা অতি গুরুতর কার্য্য। যথারীতি শুশ্রূষা (Nursing) অবগত না হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। ...সন্তান পালন। ইহা সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। সন্তান পালনের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের শিক্ষা হইয়া থাকে। একজন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, 'মাতা হইবার পূর্ব্বেই সন্তান পালন শিক্ষা করা উচিত। মাতৃকর্তব্য অবগত না হইয়া যেন কেহ মাতা না হন।' যে বেচারীকে ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমে মাতা, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে মাতামহী এবং চল্লিশ বৎসরে প্রমাতামহী হইতে হয়, সে মাতৃজীবনের কর্তব্য কখন শিখিবে? শিশু মাতার রোগ, দোষ, গুণ, সংস্কার সকল বিষয়েরই উত্তরাধিকারী হয়।

...দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীরগুণগাথা বিক্রম কাহিনী
যার গর্ব্বে তার নাচুক ধমনি।

তাই বটে, বীরাঙ্গনাই বীর-জননী হয়! মাতা ইচ্ছা করিলে শিশু-হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহাকে তেজস্বী, সাহসী, বীর, ধীর সবই করিতে পারেন। অনেক মাতা শিশুকে মিথ্যা বলিতে ও সত্য গোপন করিতে শিক্ষা দেয়। ভবিষ্যতে সেই পুত্রগণ ঠগ্-জুয়াচোর হয়। অযোগ্য মাতা কারণে-অকারণে প্রহার করিয়া শিশুর হৃদয় নিস্তেজ (Sprit low) করে, ভবিষ্যতে তাহারা শ্বেতাঙ্গের অর্ধচন্দ্র ও সবুট পদাঘাত নীরবে

অক্লেশে সহ্য করে। কোন মজুরের পৃষ্ঠে জনৈক গৌরাঙ্গ নতুন পাদুকা ভাঙ্গিয়া ভগ্ন জুতার মূল্য আদায় না করায় সেই কুলী 'নোতুন জুতা দিয়ে মারল—দামভি লইল না' বলিয়া সাহেবের প্রশংসা করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, অনেক 'ভদ্রলোকের' অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ...কেবল কাজ লইয়াই ১৬/১৭ ঘণ্টা সময় কাটানো কষ্টকর। মাঝে মাঝে বিশ্রামও চাই। সেই অবসর সময়টুকু পরনিন্দায়, বৃথা কোন্দলে কিংবা তাস খেলায় না কাটাইয়া নির্দোষ আমোদে কাটাইলে ভাল হয় না কি? সেজন্য চিত্র ও সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত। ...অথবা সুপাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নে কিংবা কবিতা প্রভৃতি রচনায় অবসর সময় যাপন করা শ্রেয়।'

রোকেয়ার নৈতিক চেতনা ও সংস্কৃতির সুর অনেক উঁচুতে বাধা ছিল, যার সাক্ষাৎ অনেক জায়গার মতো এখানেও মেলে যখন তিনি বলেন—

'আমরা শুধু নিজের সুখ-সুবিধার চিন্তায় ব্যস্ত থাকি, অপরের অসুবিধার বিষয় আমাদের মনে উদয়ই হয় না। বরং কাহারও বিপদের দ্বারা আমাদের কিছু লাভ হইতে পারে কি না, সেই কথাই পূর্ব্বে মনে উদয় হয়! কেহ দুঃসময়ে কোন জিনিস বিক্রি করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ক্রেতা ভাবেন এই সুযোগে জিনিসটি বেশ সুলভ পাওয়া যাইবে। ঈদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে দৃষ্টি রাখা শিক্ষিত সমাজের শোভা পায় না। ...দরিদ্র প্রতিবেশিনীদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করাও আমাদের অন্যতম কর্তব্য। ...বালক বালিকাদিগকে ভৃত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সচরাচর দেখা যায়, বড় ঘরের বালকেরা ভারী দাম্ভিক হয়, তাহারা চাকরকে নিতান্ত নগণ্য কি যেন কি মনে করে। বেতনভোগী হইলেও ভৃত্যবর্গ যে মানুষ এবং তাহাদেরও স্বীয় পদানুসারে মান অপমান জ্ঞান আছে, সুকুমার মতি শিশুদিগকে একথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ...পরিশেষে বলি প্রেমিক হও, ধার্মিক হও বা নাস্তিক হও, যাই হইতে চাও, তাহাতেই মানসিক উন্নতির (mental culture এর) প্রয়োজন।'

নারীর স্বপ্ন

১৯০৫ সালে ইংরেজি ভাষায় লেখা *Sultnana's Dream (সুলতানার স্বপ্ন)* একটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা। এর বাংলা অনুবাদটিও তার হাতে রচিত। সুলতানা নামের ভারতীয় এক নারী স্বপ্নে যে কল্পরাজ্য দেখেছেন এবং সারা নামের ইউরোপীয় বোনের সাথে ঘুরে দেখেছেন, কথা বলেছেন, বহু বিষয় শিক্ষালাভ করেছেন—এসব কিছুর মধ্যেই রোকেয়ার নারীজাগৃতি, নারীমুক্তির স্বপ্নই বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজটিকে উল্টোভাবে প্রতিস্থাপিত করে নারী

প্রাধান্যে পরিচালিত রাষ্ট্র ও সমাজ দেখানো হয়েছে, যার নাম নারীস্থান। এখানে পুরুষরা সব অন্তঃপুরে কর্মরত, নারীরা বাইরে। স্বপ্নের ওই দেশে সুলতানার সাথে সেদেশের সারার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজ, পুরুষ আধিপত্যের দৈন্যদশার বহু বিচিত্রমুখী চিত্র যেমন তুলে ধরা হয়; তেমনি নারীস্থানে নারী নিয়ন্ত্রণে সে সবকিছুর বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে এক স্বর্গরাজ্যের ছবিও দেখানো হয়।

সুলতানা এবং সারার সংলাপের মধ্য দিয়ে যুক্তিপূর্ণ ভাবনা-চিন্তার কৌতূহলউদ্দীপক রহস্যময়তার প্রকাশ পেয়েছে। সুলতানা বলেন—

> 'জানেন, ভগিনী সারা! সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোন হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু—তাহারা সমুদয় সুখ সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুররূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছে! উড়িতে শিখিবার পূর্ব্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়...।
>
> সারা বলেন, 'তাই ত! আমার বলিতে ইচ্ছা হয়,—দোষ কার, বন্দী হয় কে! কিন্তু বলি, আপনারা ওসব নিগড় পরেন কেন?'
>
> উত্তরে সুলতানা বলেন, 'না পরিয়া করি কি? জোর যার মুলুক তার, যাহার বল বেশী, সেই স্বামিত্ব করিবে—ইহা অনিবার্য্য।'
>
> সারা—'কেবল শারীরিক বল বেশী হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলে বিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? তাই বলিয়া কি কেশরী মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিবে? আপনাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনারা সমাজের উপর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া একাধারে নিজের প্রতি অত্যাচার এবং স্বদেশের অনিষ্ট দুই-ই করিয়াছেন। আপনাদের কল্যাণে সমাজ আরও উন্নত হইত—আপনাদের সাহায্য অভাবে সমাজ অর্দ্ধেক শক্তি হারাইয়া দুর্ব্বল ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে।'

সভ্যতার প্রথম বীজ বপন করেছিল নারী। কিন্তু সমাজবিকাশের এক ঐতিহাসিক পর্যায়ে শ্রমবিভাজন ও সম্পত্তির ধারণার ভিত্তিতে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়ে পড়লে নারী ধীরে ধীরে গৃহবন্দি ও পুরুষের দাসে পরিণত হয়। পুরুষতান্ত্রিকতাকে টিকিয়ে রাখতে নারী অবলা, দুর্বলতার প্রতীক, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র কিংবা ভোগ্যপণ্য প্রভৃতি ধারণাগুলোও পরবর্তীতে আসতে থাকে। কিন্তু *'সুলতানার স্বপ্নে'* রোকেয়া দেখালেন—নারীর ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হলে নারীরা কীভাবে ঘরে-বাইরের সমস্ত কাজ শ্রেয়তর যোগ্যতায় মাত্র ২ ঘণ্টায় সম্পন্ন করতে পারে, যেটি কিনা ভারতের রাজকর্মচারী যেমন ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রভৃতি দৈনিক ৭ ঘণ্টায়ও শেষ করতে পারেন না। সারা বলেন,

'তাঁহারা অলসভাবে বেত্রাসনে বসিয়া ধূমপানে সময় অতিবাহিত করেন। ...কেহ দৈনিক ১২টি চুরুট ধ্বংস করেন, তবে সে ভদ্রলোকটি প্রতিদিন ধূমপানে মাত্র ছয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন।'

ভারতের রোগ, জ্বরা, অকালে মৃত্যু, মহামারি বিষয়ে বিশেষ করে প্লেগ সম্বন্ধে আলোচনায় সারা দেখান—

'প্লেগ টেলেগ কিছুই নহে—কেবল দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকেরা নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে। একটু অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গ্রাম অপেক্ষা নগরে প্লেগ বেশী;—নগরের ধনী অপেক্ষা নির্ধনের ঘরে প্লেগ বেশী হয়, এবং প্লেগে দরিদ্র পুরুষ অপেক্ষা দরিদ্র রমনী অধিক মারা যায়। সুতরাং বেশ বুঝা যায়, প্লেগের মূল কোথায়—মূল কারণ ঐ অন্নাভাব। আমাদের এখানে প্লেগ বা ম্যালেরিয়া আসুক ত দেখি।'

নারীদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে পুরুষসমাজের যুক্তি, পুরুষের 'মস্তিষ্ক ত রমনীর তুলনায় বৃহত্তর' বলাতে সারার জবাব—

'মস্তিষ্ক গুরুতর হইলেই কি? হস্তীর মস্তিষ্কও ত মানবের তুলনায় বৃহৎ এবং ভারী, তবু ত মানুষ হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে।'

কথিত পৌরুষ নয়, এখানে বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবেলা করা হয় জ্ঞানের শক্তিতে বিনা রক্তপাতে, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে। সারা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেন—

'...মনে করুন আমাদের সঙ্গে অন্যূন দ্বিসহস্র সার্চলাইট ছিল, অবশ্য সে যন্ত্রগুলি ঠিক সার্চলাইটের মত নয়, ...কেবল আপনাকে বুঝাইবার জন্য তাহাকে সার্চলাইট বলিতেছি। ষ্টীমারের সার্চলাইটে উত্তাপের প্রাখর্য্য থাকে না, কিন্তু আমাদের সার্চলাইটে ভয়ানক উত্তাপ ছিল। ছাত্রীগণ যখন সেই সার্চলাইটের কেন্দ্রীভূত উত্তাপ রশ্মি শত্রুর দিকে পরিচালিত করিলেন, তখন তাহারা হয়ত ভাবিয়াছিল, কি ব্যাপার! শত সহস্র সূর্য্য মর্ত্তে অবতীর্ণ! সে উগ্র উত্তাপ ও আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুগণ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিল! নারীর হস্তে একটি লোকেরও মৃত্যু হয় নাই—এক বিন্দু নরশোণিতেও বসুন্ধরা কলঙ্কিত হয় নাই—অথচ শত্রু পরাজিত হইল! ...তাহাদের সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সূর্য্যকিরণে দগ্ধ করা গেল। ...তদবধি আর কোন প্রতিবেশী রাজা মহারাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করিতে আইসেন নাই।'

রোকেয়া তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজমননে আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার এমন এক ঢেউ তুলেছিলেন যা সমাজে নারীকে কেন্দ্র করে সকল ধরনের অধঃস্তন দৃষ্টিভঙ্গিকে ধাক্কা দিয়েছিল। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সদস্য হবার

পরও বহু নারীর ক্রন্দন-যন্ত্রণা-অসহায়ত্বকে ধারণ করেছিলেন এই মহতী। তাই ভারতবর্ষের অসংখ্য নারীর মুক্তির জন্যে একদিকে তিনি গড়ে তুলেছেন মেয়েদের স্কুল অন্যদিকে তার লেখনীর মাধ্যমে সমাজে একটি যৌক্তিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এমন এক ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে নারী-পুরুষে বৈষম্য থাকবে না এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে ভারতীয় নারীরা হয়ে উঠবে আধুনিক মানুষ। একদিনের পুরনো কাঠামোতে গড়ে ওঠা নারীর রান্নাঘর কেবলই রন্ধন-গৃহ থাকবে না, হয়ে উঠবে নন্দন কানন। 'নারীস্থান' এ রোকেয়া দেখিয়েছেন নারী রান্না করছে সূর্যের তাপে, আধুনিক প্রযুক্তির সহযোগিতায়। 'সুলতানার স্বপ্ন' এ তিনি দেখিয়েছেন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির নব নব উদ্ভাবন ও ব্যবহারে নারীরা পুরুষ আধিপত্যকালের বহু পশ্চাদপদতা কাটিয়ে অনেক অসাধ্যকে আয়ত্তে এনেছে। 'নারীস্থান'-এ নারীরা কৃষিকাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। সুলতানা এবং সারার কথোপকথনে সারা বলেন—

> 'আমরা বিদ্যুৎ সাহায্যে চাষ করিয়া থাকি। চপলা আমাদের অনেক কাজ করিয়া দেয়—ভারী বোঝা উত্তোলন ও বহনের কার্য্যও সে-ই করে। আমাদের বায়ু-শকটও তদ্বারা চালিত হয়।'

ভারতবাসীর মতো ঝগড়া-কলহ বা গৃহবিবাদে কেউ সর্বস্বান্ত হয় কিনা সুলতানার এমন প্রশ্নে সারা বলেন—

> 'না ভগিনী! আমাদের কোঁদল করিবার অবসর কই? আমরা সকলেই সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি—প্রকৃতির ভাণ্ডার অন্বেষণ করিয়া নানা প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা আহরণের চেষ্টায় থাকি। অলসেরা কলহ করিতে সময় পায়—আমাদের সময় নাই।'

নারীস্থানের অধীশ্বরীকে দেখতে সুলতানাকে অপরূপ বায়ুযানে তোলা হয় যা বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত। সুলতানা ভারতের সাথে বাণিজ্যের প্রস্তাব দিলে অধীশ্বরী বলেন—

> '...যে সকল দেশে রমণীবৃন্দ অন্তঃপুরে থাকে অথবা যে সকল দেশে নারী কেবল বিবিধ বসন ভুষণে সজ্জিতা হইয়া পুত্তলিকাবৎ জীবন বহন করে,—দেশের কোন কাজ করে না, তাহারা ...আমাদের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে অক্ষম। ...পুরুষেরা নৈতিক জীবনে অনেকটা ঋণী বলিয়া আমরা তাহাদের সহিত কোন প্রকার কারবার করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা অপরের জমি-জমার প্রতি লোভ করিয়া দুই দশ বিঘা ভূমির জন্য রক্তপাত করিনা; অথবা একখণ্ড হীরকের জন্যও যুদ্ধ করিনা, যদ্যপি তাহা কোহেনুর অপেক্ষা শতগুণ

শ্রেষ্ঠ হয়; কিংবা কাহারও ময়ুর সিংহাসন দর্শনেও হিংসা করি না। আমরা অতল জ্ঞানসাগরে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করি। প্রকৃতি মানবের জন্য তাহার অক্ষয় ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, আমরা তাহাই ভোগ করি। তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।'

এ স্বপ্নকল্পটি রচনাকাল সম্পর্কে রোকেয়া 'বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল (সফল স্বপ্ন) নামক লেখায় বলেন—

'সে বহুদিনের কথা (১৯০৫ খ্রীঃ)। তখন আমরা ভাগলপুরের বাঁকা নামক সাব-ডিভিশনে ছিলাম। মরহুম ডেপুটি সাহেব (আমার পূজনীয় স্বামী) 'টুর'-এ গিয়েছিলেন; আমি বাসায় সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম। সময় যাপনের নিমিত্ত কিছু একটা লিখিলাম। তিনি দুই দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দুইদিন আমি কি করিতেছিলাম! তদুত্তরে আমি তাঁহাকে খসড়া লেখা, '*Sultana's Dream*' দেখাইলাম। তিনি দাঁড়াইয়াই সমস্ত পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'A Terrible Revenge!' (ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!) অতঃপর তিনি সেই রচনাটা ভাগলপুরের তদানীন্তন কমিশনার মি: ম্যাক্‌ফারসনের নিকট সংশোধনের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। যথাসময় লেখাটা মি: ম্যাক্‌ফারসনের নিকট হইতে ফেরৎ আসিলে দেখা গেল, তিনি কোথাও কলমের আঁচড় দেন নাই। তিনি সেই সঙ্গে ডেপুটি সাহেবকে যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন, '...ইহাতে যে ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আনন্দপ্রদ এবং অপূর্ব্ব। রচনার ইংরাজীও নিখুঁত। ...আমি সবিস্ময়ে মনে করি, সুদূর ভবিষ্যতে আমরা বায়ু-পথে কিরূপে ভ্রমণ করিব এখানে লেখিকা তাহারই আভাস দিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার কল্পনা অতি মনোরম।' ...যে সময় আমি '*সুলতানার স্বপ্ন*' লিখিয়াছিলাম, তখন এরোপ্লেন বা জেপেলিনের অস্তিত্ব ছিল না; এমন কি সে-সময় ভারতবর্ষে মোটরকারও আইসে নাই। বৈদ্যুতিক আলোক এবং পাখাও কল্পনার অতীত ছিল। অন্ততঃ আমি তখন সে সব কিছুই দেখি নাই। প্রায় ছয় বৎসর পরে (১৯১১ খ্রীঃ) কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হাওয়াই জাহাজ অতি দূর হইতে শূন্যে উড়িতে দেখিলাম। আমি নিজে কখনও উড়ো জাহাজে উঠিতে পাইব, এরূপ আশা কখনই করি নাই। শুধু নীরবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতাম। গত ৩১শে নভেম্বর (১৯৩০ খ্রীঃ) ...শ্রীমান মোরাদ আসিয়া বলিলেন, 'খালাআম্মা, চলুন, আগামী পরশু আমার প্লেনে আপনাকে উড়াইয়া আনি;' ...তখন আমার প্রাণ অভূতপূর্ব্ব আনন্দে নাচিয়া উঠিল।'

এখানে লক্ষণীয় ১৯০৩ সালে আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (Orville Wright and Wilbur Wright) পরীক্ষামূলকভাবে ১০ ফুট উঁচুতে উঠে ১২ সেকেন্ডে

১২০ ফুট মাত্র অতিক্রম করেন। এ আবিষ্কার পৃথিবীর কম মানুষই জানতো। রোকেয়ার জানার তো প্রশ্নই উঠে না। তারপরও তার চিন্তাশক্তির ক্ষমতাবলে তিনি বায়ুযানসহ আরও বহু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিষয় ভেবেছেন যার অনেক কিছুই পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত কিংবা উদ্ভাবিত হয়েছে।

পদ্মরাগ : একটি মাইলফলক

রোকেয়ার একটি মাত্র উপন্যাস 'পদ্মরাগ'। রাজনৈতিক-সামাজিক বিদ্রোহের উপাদান সমৃদ্ধ এ উপন্যাসটি শিল্পশৈলীগত দিক থেকে সাধারণ মানের হলেও বিষয়গত দিক থেকে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এর রচনাকাল সম্ভবত ১৯০২ সাল, কিন্তু তা প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে। এ উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য হল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জাত-পাতের উর্ধ্বে উঠে নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষেরা একঘরে এক পরিবারের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মুক্তি কিংবা পুরনো সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে মানুষ যখন লড়াই করেছে তখনই তাদের মধ্যে নতুন ধরনের ঐক্য, সংহতি ও যৌথতা গড়ে উঠেছে। এ ঐক্য আমরা দেখতে পাই দাসবিদ্রোহে, ফরাসি বিপ্লবসহ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে, শ্রমজীবী-মেহনতী মানুষের মুক্তির সংগ্রামে—যেমন প্যারি কমিউন এবং রুশ বিপ্লবসহ বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে। প্রত্যেক যুগে নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের ঐক্য ও যৌথতার মধ্যে খানিকটা সাদৃশ্য থাকলেও চেতনা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য বিস্তর। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আধুনিক জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হল সামন্তীয়ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-আঞ্চলিকতা ইত্যাদি যত-ধরনের বিভেদ-বিভক্তির উপাদান মানুষের চিন্তায় ও সংস্কৃতিতে থাকে সেগুলির উচ্ছেদ। ভারতবর্ষের বুকেও সেক্যুলার গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাকে হাতিয়ার করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। বঙ্গদেশে এর ধারক ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার প্রতিনিধি সুভাষ-শরৎ-নজরুল। এ চিন্তারই অসাধারণ প্রকাশ দেখি রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে।

নিঃসন্তান তারিণীচরণ সেন নামের একজন লব্দ প্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টারের মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় পক্ষের সপ্তদশবর্ষীয় স্ত্রী দীনতারিণী দেবী 'তারিণীভবন' নামে একটি 'আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। এ ভবনেই গঠিত হয় 'নারী ক্লেশ নিবারণী সমিতি'। বিশাল ভবনের এক প্রান্তে বালিকা বিদ্যালয়, অন্য প্রান্তে বিধবা আশ্রম।

> 'যে বিধবার তিন কূলে কেহ নাই, সে কোথায় আশ্রয় পাইবে? তারিণীভবনে। যে বালিকার কেহ নাই সে কোথায় শিক্ষা লাভ করিবে? তারিণী বিদ্যালয়ে। যে সধবা স্বামীর পাশবিক অত্যাচারে চূর্ণ-বিচূর্ণ

জরাজীর্ণ হইয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সে কোথায় গমন করিবে?-ঐ তারিণী কার্যালয়ে। যে দরিদ্র দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছে তাহার আশ্রয় স্থল ঐ তারিণী আতুরাশ্রম।'

দীনতারিণী কথিত ভদ্রসমাজ থেকে চ্যুত হয়ে এদের নিয়েই তার সমাজ ও জীবন গ্রথিত করেছেন। এর জন্য তাকে আত্মীয়দের বিদ্রুপ সইতে হয়েছে—

'তারিণী আর লোক পাইবে কোথায়? কোন ভদ্র ঘরের বউ ঝি তাহার নিকট যাইবে? দেশের যত পতিতা, স্ত্রীলোক, যত কুষ্ঠরোগী, যত সব নগণ্য অনাথ শিশু, তাদের লইয়াই তো তারিনীর সংসার। এ ভবন জাতি-বিভেদের ঊর্ধ্বে—ভূভারতে এমন কোন পরিবার নাই যেখানে সর্ব ধর্ম্মের মতের মানুষ একসঙ্গে বাস করে। ...কি সুন্দর সাম্য! মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সকলে যেন এক মাতৃ-গর্ভজাতা সহোদরার ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতেছেন।'

এখানকার বিদ্যালয় সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহায্য গ্রহণ করে না। আর তাই সরকারি পাঠ্যপ্রণালীও অনুসরণ করে না—

'... বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র, সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহাদিগকে নিজের দেশ ও দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। ...দেশীয় করদ ও মিত্র রাজ্যের রাজন্যবর্গের ভিক্ষা গ্রহণ করা হয় না।'

মেয়েরা এখানে কি করে?

'...কর্ম্মালয়ে কুমারী, সধবা, বিধবা, সকল শ্রেণীর লোকই আছেন। তাহারা বিবিধ সূচীকর্ম করেন, চরকা কাটেন, হাতের তাঁতে কাপড় বোনেন, পুস্তক বাঁধাই করেন, নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। কেহ শিক্ষয়িত্রী পদলাভের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন, কেহ টাইপিং শিক্ষা করেন; কেহ রোগী সেবা শিখেন। ফল কথা এ বিভাগে রমনীগণ আপন আপন জীবিকা স্বয়ং উপার্জন করিয়া থাকেন। ...এতদ্ব্যতীত দেশের অন্যান্য হিতকর কার্য্য, যথা দুর্ভিক্ষ, বন্যা এবং মহামারী পীড়িত লোকদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই বিভাগ হইতে মহিলাগণ তণ্ডুল, বস্ত্র ও ঔষধ বিতরণ এবং রোগী সেবা করিতে গিয়া থাকেন। ...অলঙ্কারের আড়ম্বর কাহারও নাই, ...অহঙ্কার নাই, বিলাসিতা নাই। ...যেন মুনিকন্যাগণ তপোবন ছাড়িয়া সংসার ক্ষেত্রে আসিয়াছেন।'

'পদ্মরাগ'এর নায়িকা সিদ্দিকা, তার প্রকৃত নাম জয়নব। চুয়াডাঙ্গার এক জমিদার পরিবারে তার জন্ম। আরেক জমিদার পরিবারের সন্তান লতিফের সাথে বিয়ে ঠিক হলেও সে বিয়ে ভেঙে যায় লতিফের চাচার অর্থলোভ ও চক্রান্তে। লতিফ

সালেহা নামের একজনকে বিয়ে করে। চাচার সহায়তায় লতিফ বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে। বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় অপমানিত অসহায় সিদ্দিকা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তারিণীভবনের এক কর্মীর মাধ্যমে সে সেখানে আশ্রয়লাভ করে। সিদ্দিকার আগমনের পর থেকে এ আশ্রমটি সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে একটি সংগ্রামী সংঘ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে থাকে। ঘটনাচক্রে ডাকাতদের হাতে ছুরিকাহত লতিফও তারিণীভবনে আশ্রয় পায় এবং আশ্রমের মেয়েরা সকলে মিলে শুশ্রুষা করে তাকে সুস্থ করে তোলে। একেক দিন একেক জন কর্মী তাকে সেবা করে। লতিফের মনে হয়, তার মা-বোনও এভাবে তাকে সেবা-শুশ্রুষা করত না। লতিফ অনুভব করে ব্যক্তিস্বার্থমুক্ত সংগ্রামী চেতনা মানুষকে কত মানবিক-আন্তরিক ও মহৎ করে তুলতে পারে। সদস্যদের বিশ্বাস, তাদের অতীত জীবন যাই হোক,'তারিণীভবন' গঙ্গা-ইহাতে এক ডুব দিলেই সকলে পবিত্র হইয়া যায়।

লতিফের স্ত্রী সালেহা শুনেছিল লতিফের মৃত্যু হয়েছে। তাই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার জন্য স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে লতিফ টাকা চাইলে সালেহা বিশ্বাস করতে না পেরে টাকা পাঠায়নি। এবারও ওই মেয়েরাই লতিফকে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় উজাড় করে দিয়ে সহযোগিতা করে। ব্যক্তিস্বার্থের ও ভোগবাদের ঘর-সংসার, সম্বন্ধ সম্পর্ক আর সংগ্রামী চেতনার যৌথস্বার্থের মনোভাবে গড়ে উঠা ঘর-সংসার মানুষকে কত পরিবর্তিতই না করে দেয়। সালেহা জানতো যে তার সম্পত্তির জন্যই লতিফের সাথে তার বিয়ে হয়েছে। ফলে দুজনার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির ওপর, কোনোরূপ শ্রদ্ধা-ভালোবাসার ওপর নয়। আর তাই কথায় কথায় ঝগড়া, পরিবারে অশান্তি বাড়তে থাকে। অধঃপতনে থেকেও অনেক মানুষের জীবন অভ্যস্থতায় চলে যায় কিন্ত সুবিধা-অসুবিধার দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে গিয়ে তা অসহনীয় হয়ে ওঠে যখন উন্নত জীবন বা আদর্শের ছোঁয়া লাগে এবং মনের গভীরে দাগ কাটে। লতিফেরও তাই হলো। তারিণীভবনে উন্নত জীবনের যে ছোঁয়া সে পেয়েছিল সেটা তাকে টানতে থাকে।

এক সময় সিদ্দিকা জানতে পারে যে এই লতিফের সাথেই তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল এবং অন্যের চক্রান্তে বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় অনিশ্চিত জীবনের পথে পা বাড়িয়ে তাকে এখানে আসতে হয়েছিল। তারিণীভবনে লতিফের সঙ্গ এমনিতেই তাকে কিছুটা আকর্ষণ করেছিল। এর সাথে অতীত দুঃখের স্মৃতি তাকে অস্থির করে তোলে। পাশাপাশি সে তারিণীভবনে আশ্রয়প্রাপ্ত মেয়েদের জীবনের দুর্দশার কথা শোনে। তাদের সাথে নিজের দুঃখ ভাগাভাগি করার চেষ্টা করে। আমরা উষার মুখে শুনতে পাই, তাকে যখন ডাকাতরা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তার চারজন দেবর-ভাশুরের কেউ তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি। কংগ্রেসী

ভলান্টিয়াররা ডাকাতদের মোকাবেলা করে ঊষাকে উদ্ধার করে এবং তাকে তার শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দেয়। কিন্তু সেখানে তার স্থান হল না—

> 'প্রথমে শ্বাশুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনি আমাকে দেখিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বড়-জা বলিলেন,—'সেজ বউ! তুমি কোন্ আক্কেলে আবার এখানে ফিরে এলে?' মেজ-জা বলিলেন—'পীরিত জমেছিল ভালই, চার জনে নিয়ে গেল; তিন জনে দিয়ে গেল।' ...সমস্ত দিন স্বামীর দর্শন পাইলাম না। ...যে কাপুরুষ আপন স্ত্রীকে রক্ষা না করিয়া জানালায় লম্ফ দিয়া পলায়ন করিল, তাহার জন্য কোন দণ্ড তোমাদের সমাজে নাই?'

ঊষার মর্মান্তিক জীবনকাহিনী পাঠকের মনে পুরুষতন্ত্র আর ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

লতিফের সাথে পুনরায় সিদ্দিকার দেখা হয়। ইতোমধ্যে লতিফের স্ত্রী সালেহা মৃত্যুবরণ করেছে। সিদ্দিকার যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়। এক পর্যায়ে লতিফ সিদ্দিকাকে বিয়ে করতে চায়। অনেকেই তাকে লতিফকে বিয়ে করার পরামর্শ দিল। কিন্তু তার মনে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে—একদিকে অতীতের উপেক্ষা ও লাঞ্ছনার স্মৃতি আর অন্যদিকে লতিফের সঙ্গ-সাহচর্য এবং তার প্রতি আকর্ষণ।

> আরো অনেকের মতো তারিণী বললেন, 'তুমি সে সব সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও। এখন একটি নূতন মানুষ মিঃ লতীফ আল্‌মাস্‌কে বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর। ...আমাদের কথা রাখ, পদ্মরাগ!'
> তখন সিদ্দিকা জবাবে বলে, 'বড় দুঃখের বিষয় বড়দিদি! আপনিও ঐ কথা বলেন? আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দেই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকুম্মাগণ উদীয়মান তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন, 'আর রাখ তোমার পণ ও তেজ-ঐ দেখনা, এতখানি বিড়ম্বনার পরে জয়নব আবার স্বামী-সেবাই জীবনের সার করিয়াছে।' আর পুরুষসমাজ সগর্বে বলিবেন, 'নারী যতই উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহীয়সী, গরীয়সী হউক না কেন-ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে!' আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসার ধর্ম্মই জীবনের সারধর্ম্ম নহে। পক্ষান্তরে আমার এই আত্মত্যাগ ভবিষ্যতে নারীজাতির কল্যাণের কারণ হইবে বলিয়া আশা করি।'

'তারিণীভবনে'র সংগ্রামী জীবন সিদ্দিকার মধ্যে নতুন ধরনের মর্যাদাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম দিয়েছে। সিদ্দিকা এখন নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার আদর্শ এবং কর্তব্য নিষ্ঠার জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দেয়া এবং

বড় অর্জনের জন্য ক্ষুদ্র বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মানবচরিত্র যে কতো স্পর্ধিত, আকর্ষণীয় মাধুর্য্যমণ্ডিত দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে তাও সিদ্দিকার চরিত্র চিত্রনের মাধ্যমে স্বার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একজন মানুষের আত্মত্যাগ এবং দৃঢ় সংকল্প বহু দ্বিধান্বিত মানুষের চিত্তের দোলায়মানতা কাটাতে সাহায্য করে, সত্যের কঠিন শিলায় দাঁড়ানো সাহসী অঙ্গীকার বহু আপস দুর্বলতার মোহ ভেঙে মানুষকে জাগিয়ে তোলে বিশ্বাসে-দ্রোহে অপার সম্ভাবনার শক্তিতে। তারিণী সিদ্দিকার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,

> 'ধন্য মেয়ে! ভবিষ্যৎ নারীজাতির কল্যাণের নিমিত্তে এইরূপ আত্মোৎসর্গেরই প্রয়োজন!' বাঞ্ছনীয় বিষয় যত মূল্যবান, তাহার জন্য উৎসর্গও ততই মহার্ঘ হওয়া চাই! ...সকিনার জীবনপাত, জয়নবের আত্মবলিদান কখনও বিফল হইবে না। ভারত মাতা! কে বলে তুই দীনা কাঙ্গালিনী? তোর এ হেন দুহিতা রত্ন থাকিতে তুই কিসের ভিখারিণী?'
>
> সৌদামিনী সিদ্দিকাকে প্রশ্ন করে যে লতিফ তাকে এত ভালোবাসার পরও কেন সে লতিফের 'জীবনটা অভিশপ্ত করিবে?'
>
> জবাবে সিদ্দিকা বলে, 'তা কি আর করা যায়? না হয় প্রতিদানে আমিও তাহাকে ভালবাসিব।'
>
> ভালবাসার নৈর্ব্যক্তিক রূপ একটা বড় মনের শক্তিশালী অর্জন যা লতিফের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। তাই লতিফ এর মূল্য দিতে না পেরে যখন বলে, 'সিদ্দিকা, স্পষ্ট বল, তুমি আমার গৃহিণী হইবে কিনা? সিদ্দিকা বলতে বাধ্য হয়, না। তুমি তোমার পথ দেখ, আমি আমার পথ দেখি।'

এ উপন্যাসে মূলত নিপীড়ন-নির্যাতন-বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াকু মানুষদের একটা সংঘশক্তির রূপ তুলে ধরা হয়েছে। সিদ্দিকার আকুল জিজ্ঞাসা,

> 'সমাজের এই সব নালীঘায়ের কি ঔষধ নাই? বাতুলের সহিত চিরজীবন আবদ্ধা থাকিতে হইবে, বিনাকারণে পরিত্যক্তা হইতে হইবে, অবমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্নী সমভিব্যহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহোদর ভাই হাতপা বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইতে চাইবেন, স্বামী বাতায়ন উল্লম্ফনে পলায়ন করিলেন বলিয়া স্ত্রীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে,—ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?'

উত্তরে সৌদামিনী বলছে,

> 'আছে! সে প্রতিকার এই তারিণীভবনের 'নারী ক্লেশ নিবারণী সমিতি'। এস যত পরিত্যক্তা, কাঙ্গালিনী, উপেক্ষিতা, অসহায়া, লাঞ্ছিতা—সকলে এস। তারপর সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা! আর তারিণীভবন আমাদের 'কেল্লা'।'

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, সকল রাজনৈতিক উপন্যাসে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের বিধৃত ইতিহাসে সংগ্রামী ব্যক্তিরা স্বীয় পরিবার থেকে এসে সংগ্রামের মাঠে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু সংগ্রামী মানুষদের এ ধরনের স্বতন্ত্র ঘর-পরিবার দেশ-বিদেশের খুব কম সাহিত্যেই হয়ত পাওয়া যাবে। এখানে রোকেয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ধারার স্রষ্টা। নিপীড়িত নারীদের সংঘশক্তি নির্মাণের যে চিত্র রোকেয়া তুলে ধরেছেন তা থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের অনেক কিছুই নেয়ার আছে। আজকের দিনে যারা পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানোর সংগ্রাম করবেন, তাদেরকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনযাপনের বিপরীতে যৌথজীবন গড়ে তোলার সংগ্রামে নামতে হবে। এটা একটা সাংস্কৃতিক সংগ্রাম। ইতোমধ্যে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে যৌথজীবন গড়ে তোলার ধারণা এসেছে এবং দেশে দেশে তার চর্চাও হচ্ছে। আমাদের দেশেও কমিউন, সেন্টার, হাউজ, মেস ইত্যাদি গড়ে তোলার সংগ্রামে রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জোগাবে।

উপন্যাসটিতে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে চরিত্রগুলো সংলাপে, বিভিন্ন ঘটনায় রোকেয়া ধর্মীয় সংস্কার-কুসংস্কারের নিগড়, পুরুষতন্ত্রের জবরদস্তি, সমাজের অন্যায়-বৈষম্য, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার, পরাধীনতার গ্লানি ইত্যাদি নানা বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেমন হেলেন নামের এক ইংরেজ নারীর ঘটনার মাধ্যমে রোকেয়া তুলে ধরেছেন যে দুনিয়ার যেখানেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আছে সেখানেই নারী নির্যাতিত, নিপীড়িত, এমনকি তথাকথিত উন্নত ইংল্যান্ড হলেও। হেলেন চরিত্রহীন অত্যাচারী স্বামীর কাছ থেকে মুক্তির আশায় তালাক চেয়েছিল, কিন্তু আদালত সে আবেদন মঞ্জুর করেনি—

> 'স্ত্রী ভাগ্য ভারতে-ইংল্যান্ডে তেমন পার্থক্য নেই, এমনকি আদালত পর্যন্ত নারী স্বার্থ পরিপন্থি। পুরুষতন্ত্রের পক্ষপাতি। ...এই ইংলন্ড—এই পুঁতিগন্ধময় পচা ইংলন্ড আবার সভ্যতার দাবী করে।'

রোকেয়া বিভিন্ন নারী চরিত্রের সংগ্রামী মনোভাবের মধ্য দিয়ে নারীদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

> মুসলিম নারীদের দুর্দশার কথা শুনে উপন্যাসের একটি চরিত্র হেলেন জিজ্ঞাসা করছে, 'অকারণ তালাকের বিরুদ্ধে কোন আইন নাই কি?'
> নবজাগ্রত মর্যাদাবোধের ভিত্তিতে রাফিয়া বলছে, 'থাকিলেও আমি তাহার স্মরণ লইতে ঘৃণা বোধ করি! যে নিষ্ঠিবনের মত পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার তাহার দিকে ফিরিয়া দেখা কেন?'
> আরেকটি চরিত্র সকিনা বলছে, 'আমিও ঐ জন্যই তারিণী ভবনে আসিয়াছি, আমিও দেখাইতে চাহি যে দেখ, তোমাদের 'ঘর করা' ছাড়া আমাদের আরও পথ আছে। স্বামীর ঘর করাই' নারী জীবনের সার নহে।

মানব-জীবন খোদাতালার অতি মূল্যবান দান—তাহা শুধু 'রাঁধা-উনুনে ফু-পাড়া আর কাঁদার' জন্য অপব্যয় করিবার জিনিস নহে! সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধঘোষণা করিতেই হইবে।'

তার এ সংকল্প শুনে উষা প্রথাগত সামাজিক চিন্তার প্রতিধ্বনি করে বলছে, 'তাহা হইলে শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অশান্তির চিতা জ্বলিবে যে!'

রাফিয়া বলছে, 'চাহি না শান্তি! চাহি না মৃত্যুর মত নিষ্ক্রিয় ক্লীব শান্তি!! আর এই 'অবরোধ'—প্রথার মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে, এইটাই যত অনিষ্টের মূল! লাঠি ঝাঁটা হজম করিয়া 'অবরোধ' প্রথার সম্মান রক্ষা—আর নহে!'

মানবিক মূল্যবোধ ও নন্দনতত্ত্ব

মানুষের জীবন স্নেহ-মমতা-প্রীতির নানা বন্ধনে জড়িয়ে থাকে যার প্রকাশ ঘটে নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে। এসব মানবিক গুণ মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামের অর্জন। ফলে কোনো একটা বিশেষ রূপকেই জীবনের একমাত্র সর্বস্ব করে তুলতে গেলে তার সৌন্দর্যহানি হয়। রোকেয়া প্রেম-ভালোবাসাকে একটা উদার উচ্চ হৃদয়বৃত্তির আধারে-বাঁধা মানব সম্পর্ককে বুঝতেন। তারই অংশ হিসেবে নর-নারীর প্রেম-ভালবাসাকে একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ রূপ হিসেবে দেখেছেন। এর সাথে আছে মানুষের সৌন্দর্যবোধ এবং রুচিবোধ।

'প্রেম রহস্য' রচনায় রোকেয়া বলেছেন,

> '...যাহা সুন্দর মনোহর, মানুষ তাই ভালবাসে। শৈশবে চন্দ্রমার প্রতি আমাদের অকপট ভালবাসার ঐ কারণ। শিশু ফুল ভালবাসে যেহেতু ফুল অতি সুন্দর। এই নিয়ম অনুসারে যাবতীয় উপন্যাসের নায়িকাই 'সুন্দরী' হইতে বাধ্য হইয়াছে। নহিলে নায়িকা প্রথমে দর্শকের নয়নরঞ্জন, অতঃপর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইতে পারে না। বলি, যদি কেহ ঐ নিয়ম ভঙ্গ করে? অর্থাৎ যদি কোন কুৎসিত বিশ্রী বস্তুকে ভালবাসে, তবে কি সে কবিসমাজের বিধান অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবে?'

মানুষের সৌন্দর্য আর প্রাকৃতিক বস্তুসামগ্রী, জন্তু-জানোয়ারের সৌন্দর্য এক মানদণ্ডে মাপা যায় না। সুষমা, রঙ, কাঠামোগত সৌন্দর্যই মানব-সৌন্দযের একমাত্র প্রকাশ নয়। মানুষ জৈবিকসত্ত্বা থেকে সাংস্কৃতিকসত্তায় উত্তরণ ঘটিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারে। মানুষের জন্য মানুষের নিবেদন, উৎসর্গ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামে অগ্রসরমান মানবিক বিপ্লবী বৈশিষ্ট্যও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। রোকেয়া তিনটি গল্প দিয়ে ব্যতিক্রমী কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চেয়েছেন। রোকেয়া অসুস্থ হওয়ায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য কিছুদিন ওড়িষ্যায় ছিলেন। তখন একটি বালিকা রোজ রোজ জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে রোকেয়ার মুখমণ্ডলের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতো। নাম চম্পা।

একদিন তাকে রোকেয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, সে রোজ কেন আসে?
চম্পা মাথা নিচু করে মৃদু হেসে বলল, তোমাকে দেখিতে। 'বলিয়াই আবার শঙ্কিত হইল; সভয়ে আমার মুখ দেখিতে লাগিল।
আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বালিকা পলায়ন করিল। ...মানব হৃদয় বুঝি চিরদিনই প্রেম-ভিখারী, তাই (যদিও আমার স্নেহময় আত্মীয় স্বজনের অভাব ছিল না তবু) এ অযাচিত প্রেমলাভে কাঙ্গালের ধনরত্নলাভে আহ্লাদিত ও গর্ব্বিত হওয়ার ন্যায়, আমিও অতিশয় পুলকিত হইলাম।'

একদিন আয়া তাকে অতি কর্কশস্বরে রোকেয়ার কাছে ঘনিষ্ঠ না হয়ে দূরে দাঁড়াতে বলে। আয়ার নিষ্ঠুর ব্যবহারে তিনি ব্যথিত হয়ে তাকে তিরস্কার করায় সে বলল, 'ও যে জাতে চাঁড়াল; ওর ছায়া মাড়াতে নেই।'
কিন্তু রোকেয়া তাকে ভালোবেসেছিলেন, 'চম্পা অস্পৃশ্য চণ্ডাল...অতি কালো কুৎসিত ছিল, তবু আমি তাহাকে দেখিলে সুখী হইতাম। এই বিমল বিশুদ্ধ ভালবাসা নিয়ে অন্যেরা আমোদ করতো।'

একটি ঘটনায় ভয় পেয়ে চম্পা আসা বন্ধ করে দেয়। রোকেয়ার মন চম্পার অনুপস্থিতির কারণে উদাসীন ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে রোকেয়ার নাওয়া-খাওয়া অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। একজন মনে করেছিলো রোকেয়ার স্বামীর কাছ থেকে পত্র কিংবা সংবাদ না পাওয়াতে হয়ত মন খারাপ। রোকেয়া বললেন, ঐ সময় স্বামী নয়, তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে চম্পাই বিরাজ করছিল। শেষে একদিন চম্পাকে ডাকতে গেলে তার মা লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল,

'চম্পা পিলা মনুষ্য—হু হু হু!' ব্যাপার দেখিয়া আমি তো অবাক! চম্পা ছেলেমানুষ, সেজন্য তাহার মাতা কাঁদে কেন? পরে বুঝিলাম, 'হাকিম বাবু' স্বয়ং চম্পার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাই তাহাদের বিপদ এবং ভয়ের কারণ!'

তারপর আর একটি গল্প উল্লেখ করে তিনি বলেন,

'একবার আমি একটি ইংরেজ বালাকেও ভালবাসিয়াছিলাম। তিনি শ্বেতাঙ্গী, আমি কৃষ্ণাঙ্গী—এক কথায় বলি, আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক, ...তবু আমাদের উভয়ের হৃদয়ে অকপটে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল মিস্ ডিও ইহা স্বীকার করিতেন। ...তাঁহাকে শেষ বিদায় দিবার জন্য আমি স্টেশন পর্যন্ত গিয়াছিলাম। ...বাঁশি শুনিলাম; গাড়ী চলিবার শব্দও শুনিলাম, —তখন মনে হইল যেন ট্রেনখানা আমার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেল!'

আর একটি ঘটনা—

'একজন প্রবীণা মোসলেম ললনাকে আমি অত্যন্ত ভক্তি করিতাম, তিনিও সুদে আসলে আমার ভালবাসা প্রত্যর্পণ করিতেন। ...পরমেশ্বর মানবের

অতি-প্রেম সহ্য করিতে পারেন না; সুতরাং আমার মাননীয়া বন্ধুটি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলেন। আমি স্বেচ্ছায় তাহার অবৈতনিক সেবিকা হইলাম। ...জীবনে এই প্রথমবার (আত্মীয় ব্যতীত অপর) রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। পরের সেবায় এত সুখ, শান্তি, ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে—তাই আমারও এ সুখ শান্তিটুকু দেখিতে না দেখিতে—প্রাণ ভরে অনুভব করিতে না করিতে ফুরাইয়া গেল।...যে পথ্য আর কেহ প্রস্তুত করিলে অখাদ্য হইত, তাহা আমার করস্পর্শে সুস্বাদু হইয়া যাইত। প্রেমের কি আশ্চার্য্য ক্ষমতা।'

তার মৃত্যুর সময়ে 'আমি তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলাম, ...অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, ''বহিন!'' আজ বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছি।' সেই ''বহিন'' শব্দটি কেমন ভালবাসার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল, তাঁহা যে একবার শুনিয়াছে সে আর এ জীবনে ভুলিতে পারে নাই। ...আমার সম্মুখেই কি করিয়া তাহার প্রাণপাখী উড়িয়া গেল, দেখিতে পাইলাম না।'

রোকেয়া বলছেন,

'...প্রেমের আলোচনা যতই করি, ততই দেখি ...প্রেমিক হৃদয় নবনীসদৃশ কোমল; আবার পাষাণৎ কঠিন। কখনও দেখি, প্রেম অতিশয় দৃঢ়, কখনও দেখি ভঙ্গ প্রবণ! ইহা শিশুর হৃদয়ে থাকে, প্রবীণ হৃদয়েও থাকে—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়। প্রেম কি স্বর্গীয় কোন তরুর মত—আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ শাখা পল্লবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে? অথবা প্রেম কি কোন ভাষার মত, রাগরাগিনীর মত মানবের প্রাণে নানা ছন্দে ঝঙ্কারিত হয়? যাহা হউক বুঝা গেলনা, প্রেমের স্বরূপ কি। বুঝিলে এইমাত্র বুঝি, প্রেমের আদি অন্ত নাই ...।'

শুধুমাত্র জৈবিক অস্তিত্বের সীমানা অতিক্রম করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ মানুষ হয়ে ওঠার কাল থেকে মানবিক অস্তিত্ব তার সাথে যুক্ত হয়। আকৃতিগত মিলের প্রাণী—যুথবদ্ধতা থেকে উৎপাদন সম্পর্কে মানুষের সমাজবন্ধন গড়ে ওঠে। বৈষয়িক উৎপাদনের পাশাপাশি ভাবগত উৎপাদন মানুষের মানবিক অস্তিত্বকে আরও নিবিড় করে গাঁথতে থাকে। তারই অংশ হিসেবে বহু বিচিত্ররূপে মানুষে মানুষে পারিবারিক সামাজিক সম্বন্ধ-সম্পর্ক দেখা দিতে থাকে। সেজন্য আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধের রূপান্তর ঘটে। আবার একই আর্থসামাজিক ব্যবস্থায়ও একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের মাঝেই বহু বিচিত্র ধরনের সম্পর্ক বিরাজিত থাকতে পারে। বস্তুগত উৎপাদন যত বাড়তে থাকে অর্থাৎ উৎপাদন শক্তি যত বিকশিত হয় মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দও তত বাড়ে। যদিও শোষণের ব্যবস্থায় সকল মানুষ তা ভোগ করতে পারে না। একইভাবে ভাবগত উৎপাদনও যত বহুমুখী সমৃদ্ধতা নিয়ে সমাজ মননে ক্রিয়াশীল

হতে থাকে ততই মানুষের সম্পর্ক-স্বভাবের মধ্যেও অনেক গুণগত উৎকর্ষ দেখা দেয়। প্রকৃতিপ্রেম, ঈশ্বরপ্রেম, জীবপ্রেম, নর-নারী প্রেম, মানবপ্রেম—এর কোনোটাই নির্বিশেষ শাশ্বত নয়। আদিমকালে, দাসযুগে বা সামন্তসমাজেও মানুষে মানুষে, নর-নারীতে তৎকালীন প্রাকৃতিক-সামাজিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আধুনিক অর্থে প্রেম-ভালোবাসা বুর্জোয়া বিপ্লবের আকুতি তৈরি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেখা যায়নি। আবার বুর্জোয়াদেরও উত্থানের যুগে প্রেম-ভালোবাসার যে সৌন্দর্য-মাধুর্য ছিল, আজ তার চূড়ান্ত অবক্ষয়ের কালে (সাম্রাজ্যবাদ) এসে সে মাধুর্য আর অবশিষ্ট নেই। এখন মুনাফা আর স্বার্থই হল সম্পর্কের চালিকাশক্তি। ভোগবাদিতায় আচ্ছন্ন হয়ে আসক্তি আবিলতায় ডুবে তা আত্মকেন্দ্রিক প্রয়োজনবাদভিত্তিক উত্তেজক সম্পর্কের রূপ ধারণ করেছে। আজ ভোগবাদী-পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের মধ্যেই আবার জাগ্রত হতে পারে আরও চেতনাসমৃদ্ধ প্রেম-ভালবাসা যা হবে সাম্য-সমাজের অনুগামী মানবপ্রেমের অংশ। বিশ্ব মানবকুলব্যাপী ভালবাসার বিস্তারে শ্রেণিচেতনার আধারে আবির্ভূত হবে সত্যিকার মূর্ত নির্দিষ্ট মানবপ্রেম যা আদিমরস, স্থূল ভোগচাহিদা ও আত্মকেন্দ্রিকতা মুক্ত সামাজিকচেতনা-সমৃদ্ধ নারী-পুরুষ সম্পর্কের এক শৈল্পিক রূপ নিয়ে মানবজীবনে সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ভূমিকা পালন করে যাবে।

নারীমুক্তির সংগ্রামে রোকেয়া আমাদের হাতিয়ার

রোকেয়ার মাঝে অতীত মনীষীদের কথা, ভাব-চিন্তা তার সময়ে একটা ভিন্ন মাত্রা ও তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আজ বাংলাদেশের বাস্তবতায় রোকেয়ার জীবন ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা যে কত জরুরি তা যে কোনো চিন্তাশীল বিবেকবান মানুষ অনুভব করেন।

রোকেয়ার জন্ম-মৃত্যু দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, ছবিতে মালা দিয়ে কিছু শ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্য উচ্চারিত হয়, কিন্তু তারপর? আমাদের সমাজজীবনে, ব্যাপক জনসমাজের মধ্যে রোকেয়াকে স্মরণ করা হয় কতটুকু? রোকেয়ার জীবন সংগ্রাম, জীবনবোধের মধ্য দিয়ে যে উন্নত মানবতাবাদী মূল্যবোধের স্ফূরণ ঘটেছিল, তার চর্চা কোথায়? আমাদের দেশের মেয়েরা কজন রোকেয়াকে জানে? অথচ রোকেয়া ছিলেন সে যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল সময়ে নারীস্বাধীনতার বার্তাবাহী এক জ্বলন্ত মশালের মতো। তিনি কেবল নারীস্বাধীনতার কথা বলেছেন তা নয়, তাঁর নিজের জীবন দিয়ে দৃষ্টান্ত রেখেছেন। সমাজের এককোণে পড়ে থেকে নীরবে জ্ঞান সাধনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, নিজের হাতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লিখে চেষ্টা করেছেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে

সমাজের মধ্যে আধুনিক চিন্তা-চেতনার বিস্তার ঘটাতে। মহান বিদ্যাসাগরের মধ্যে আমরা নারীশিক্ষার জন্য যে আকুতি দেখেছি তারই যেন প্রতিফলন পেয়েছি রোকেয়ার মধ্যে। তিনি ধর্ম সম্পর্কে, ধর্মীয় আচার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু সেটাও করেছেন প্রখর বিবেচনা ও বাস্তববোধ নিয়ে। আজকের সময়ে আমাদের দেশের যে নারীরা নারীস্বাধীনতার যথার্থ লড়াই গড়ে তুলতে চান, তারা রোকেয়ার জীবন ও রচনা থেকে শেখার বহু বিষয় পাবেন। রোকেয়াকে জানবার ও বুঝার প্রয়োজন নিছক একাডেমিক বিষয় নয়, তা আজকের নারীমুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধ একদা সমাজের স্তরে স্তরে যে গণতান্ত্রিক চেতনার জন্ম দিয়েছিল, মানবতাবাদী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির স্ফুরণ ঘটিয়েছিল, আজ সমাজ তা থেকে বহুদূর সরে এসেছে। আমরা শুধু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংকটেই জর্জরিত হচ্ছি না, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট, মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের সংকট আজ গোটা সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এদেশের যুবসমাজ একদিন নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত দিতে দ্বিধা করেনি, আজ সেই যুবসম্প্রদায়ের একাংশের হাতে নারীর সম্মানহানি ঘটছে, যুবক-তরুণদের হাতে অপমানিত হয়ে মেয়েরা আত্মহত্যা করছে। এভাবে সমাজের অন্যান্য অংশে চোখ ফেললেও দেখা যাবে, সর্বত্রই মূল্যবোধের সংকট অত্যন্ত গভীর। কিন্তু কেন? আসলে সমগ্র ভারতীয়সমাজে নবজাগরণ ও তার পরবর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ধারায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রমুখ যেসব মনীষী মানবতাবাদী মূল্যবোধের জয়গান গেয়েছিলেন, তাঁদের চিন্তার মধ্য দিয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে পতাকা উড়েছিল, আমরা তার সাথে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। এ কথা ঠিক যে, আজ চূড়ান্ত অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের স্তরে মানবতাবাদী মূল্যবোধ আমাদের বেশিদূর এগিয়ে দিতে পারবে না, সেজন্য দরকার সর্বহারা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের চর্চা। কিন্তু মানবতাবাদী মূল্যবোধের সাথে যোগসূত্র স্থাপনা ও চর্চার মধ্য দিয়ে তার নির্যাস চরিত্রে গ্রহণ না করে আমরা সর্বহারা মূল্যবোধকে ধারণ করতে পারব না। এজন্যই আমাদের দেশে একসময়ে যাদের জীবন ও কাজের মধ্য দিয়ে, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানবতাবাদী মূল্যবোধের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছিল তাদের জানা, বুঝা ও চর্চা করা দরকার। রোকেয়ার সংগ্রাম ও চিন্তাকে আত্মস্থ করার গুরুত্ব এখানেই। রোকেয়ার সময় এবং বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে তার শিক্ষাকে পাথেয় করে আজকের নারীমুক্তি তথা মানবমুক্তির বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রতিটি বিবেকবান গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নারী-পুরুষের কর্তব্য।

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম
২৩/২ তোপখানা রোড (৩য় তলা) ঢাকা-১০০০